প্রতিষ্ঠাব্দ ১৩১৭ ইং ১৯০৯। Established 1909.

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'নাট্য-মন্দির' ও 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত

নাট্য-ভারতী

শত পর্ব নাট্য-গ্রন্থমালার—১ম পর্ব

নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থমালা

(আষাঢ়—১৩৫১ : June, 1944)

প্রথম পর্বের পাঠ-সূচি

নাট্য-ভারতীর দ্বিতীয় পর্বের পাঠ-সূচি

প্রকাশক

ভারতী সাহিত্য ভবন

৪৩এ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—দেড় টাকা।

নিয়মাদি

বিজ্ঞাপন	থিয়েটার, সিনেমা, নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত সরস প্রবন্ধ বা সুচিন্তিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।
রচনা	বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনগুলিকে নাট্যাকারে সাজাইয়া পাঠ্যের মর্য্যাদা দিয়া প্রকাশের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন নাট্যাকারে (Dramatic From) লিখিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

মুদ্রাকর

ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪৩এ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাশ কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ভারতী
সাহিত্য ভবনের পক্ষ হইতে প্রকাশিত।

সমর্পণ

বর্ত্তমান সঙ্কটের মধ্যেও

শিক্ষা ও গঠনমূলক সাহিত্য-সাধকগণ

সর্বতোভাবে যাঁহার আনুকূল্য লাভে

ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন

কলিকাতার প্রাচীন অভিজাত-বংশীয়

সেই স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

সহৃদয় সাহিত্য-রসিক

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র সিংহ

মহাশয়ের করকমলে

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

বহু আয়াসে সঙ্কলিত

নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থমালার

উপক্রমণিকা পর্বটি

অদ্য রথযাত্রা-বাসরে

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম

নাট্য-ভারতী

প্রাক-বাক্য

১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৯০৯ জুলাই) কলিকাতায় এক সঙ্গে দুইখানি নাট্য-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। একখানির প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন স্বনামখ্যাত নাট্যবিদ্ অমরেন্দ্র নাথ দত্ত: পত্রিকাখানির নাম—'নাট্য-মন্দির'। অপর খানির প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন তৎকালের তরুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; পত্রিকাখানির নাম—'রঙ্গমঞ্চ'।

'নাট্য-মন্দিরে'র সূচনায় নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—পরিব্রাজক মাত্রেই বিদেশে যাইয়া তথাকার লোকের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, আর্থিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিবার ইচ্ছা করেন। তাহার সহজ উপায়—নাট্য-মন্দির দর্শন। তথায় দেখিতে পান, শিল্পীরা কিরূপ উন্নত, কবি কিরূপ ভাবাপন্ন এবং দর্শকবৃন্দও কি রসে আকৃষ্ট। মানবের প্রধান পরীক্ষা—তাহার রুচি। সে রুচির পরিচয়—'নাট্য-মন্দিরে' সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হন। অতি উচ্চ হইতে নিম্নস্তরের মনুষ্য পর্য্যন্ত এককালীন দেখিতে পান এবং জাতীয় রুচি সাংসারিক অবস্থায় কিরূপ পরিমাণে প্রভেদ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। কার্য্যক্লান্ত মানবের আনন্দ প্রদানের জন্ত 'নাট্য-মন্দির' সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেবল আনন্দ-দানে তাহার তৃপ্তি নহে, 'নাট্য মন্দির' কলাবিদ্যাবিশারদের কার্য্যস্থল। নবরসে আপ্লুত হইয়া দর্শক তাঁহার সুখ স্বপ্নে যামিনী যাপন করেন। বঙ্গদেশেও সেই আনন্দ প্রদায়িনী 'নাট্য-মন্দির' হইয়াছে। এ নাট্য-মন্দিরের

অনেক ত্রুটি রহিয়াছে এবং উন্নতির যে অনেক অপেক্ষা, তাহা মন্দির অধ্যক্ষেরা অকপটে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণপণ উদ্যম ও আজীবনের আকিঞ্চন, নিন্দার বিষদন্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। নিন্দুকের এক আশ্চর্য্য শক্তি! তাহারা একরূপ সর্ব্বজ্ঞ। সমুদ্রের গর্জ্জন না শুনিয়াও—ফরাসী দেশের নাট্য-মন্দির কিরূপে চলিতেছে, তাহা তাঁহারা জানেন এবং আমাদের দেশের নাট্য-মন্দির যে ফরাসী দেশের নাট্য-মন্দির নয়, তজ্জন্য ঘৃণা করেন। গৃহে বসিয়া বিলাতের 'ড্রুরিলেন' থিয়েটারও দেখিয়াছেন, সার্ হেন্‌রি আর্‌ভিংকে তথায় আনাইয়া, তাঁহার অভিনয়ও শুনিয়াছেন; সুতরাং কথায় কথায় বিলাতের নাট্য-মন্দিরের সহিত আমাদের নাট্য-মন্দিরের তুলনা করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃশ্যপট সেরূপ নয়, এই নিমিত্ত নাসিকা উত্তোলন করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐরূপ নাসিকা উত্তোলনের বাক্যচ্ছটা ব্যতীত, ফরাসী ইংলণ্ড বা আমেরিকার কিছুই নাই। আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের অনিষ্টকর কার্য্যে বড়ই দুঃখিত। তাঁহাদের কলুষ বাক্য অপরের মন কলুষিত করিতে পারে, সেই নিমিত্ত এই মাসিক 'নাট্য-মন্দির' সাধারণকে উপহার দিবার জন্য আমরা উৎসুক। সকল সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যাহা লেখেন, তাহাও শুনিতে হয়। কিন্তু অনেকদিন শুনিয়া আসিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনাদের আপনি সমালোচক হইয়া 'নাট্য-মন্দির' প্রকাশিত করিব। সাহিত্যও আমাদের প্রধান আলোচনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলোচনা করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আমরা দ্বারে দ্বারে সেই উৎসাহের প্রার্থী।

'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার সূচনায় সম্পাদক বলেন :—অনেকদিন হইতে যাহা

কল্পনা করিতেছিলাম, এতদিনে তাহা হঠাৎ সত্য হইয়া দাঁড়াইল। 'রঙ্গমঞ্চ', কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ইহার নামেই উদ্দেশ্য কতকটা বুঝা যায়। নট-নাটক নাট্যশালা লইয়া অপক্ষপাতে আলোচন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি, চারণ বা মিন্‌ষ্ট্রেলের গীতে সকল জনসমাজেই বিকাশোন্মুখ জাতির মনোভাবের প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে,—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখনও থিয়েটার ও যাত্রা দ্বারা অনেক ভাব মানবসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। ইহা ভিন্ন অভিনয় বা অভিনয়ের অনুরূপ, বিলাস-সংবলিত ছন্দোবন্দে গ্রথিত ভাবময় ভাষা হইতেই সকল জাতির সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ মানবসমাজ উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে,—সেইজন্য সেই আদিম কালের নৃত্যগীত উন্নত হইয়া যাত্রা ও থিয়েটারে পরিণত হইয়াছে। কোন জাতির চিত্ত-বিনোদনের উপায় দর্শনে সেই জাতি সভ্যতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। মানবসমাজের সভ্যতা যেমন যাত্রা ও থিয়েটার প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ উহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষও মানব-সমাজের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। জাতীয় রুচি-অনুসারেই যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি সামাজিক চিত্তবিনোদনের উপায়গুলি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল অনুষ্ঠানের উন্নতি বিধানে সামাজিকগণেরও রুচি ও ভাব উন্নত হইবার অবকাশ পায়, ইহা সুধীসমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত মহাদেশে জনসাধারণের চিত্তসুখকর অনুষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে সমাজ-হিতৈষিগণ প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত ঐ সকল দেশে নানা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে লোকশিক্ষা-কল্পে অনেক পুস্তকও মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে

এ বিষয়ে আমাদের দেশে বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। সেই অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই 'রঙ্গমঞ্চে'র আবির্ভাব। নাট্যবন্ধুগণ ইহাকে বন্ধুভাবে আদর করেন, এই প্রার্থনা। ইহার উপদেশ বা সমালোচনাকে কেহ স্বার্থমণ্ডিত বা পরশ্রীকাতরতা হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া বিরক্ত না হন, এই মিনতি। যে দেবতা পুরাণে 'নটনাথ' নটেশ' 'নর্ত্তক' নামে বর্ণিত, যাঁহার নৃত্যলীলাপরায়ণ রূপের প্রতিমামাত্র দেখিয়া বিদেশীয় শিল্পাচার্য্যগণ মোহিত হইয়াছেন,—যাঁহার নৃত্য-বেগে জগতের জীবনীশক্তির মূলীভূত তাপ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, যাঁহার ডমরুধ্বনিতে অক্ষরদ্যোতক ধ্বনির উৎপত্তি, যাঁহার গানে গীত, নাচে নৃত্যের বিকাশ —অর্থাৎ যাঁহা হইতে ধ্বনি অক্ষর ব্যাকরণ গীত সুর নৃত্য সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই সকল রঙ্গের বিধাতা রঙ্গনাথ নটনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া এই 'রঙ্গমঞ্চে'র শুভারম্ভ করিতেছি। নট-নাটক-নাট্যশালার আলোচনায় নটনাথের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিয়া সংসার নাট্যশালায় সঙ্কল্পিত অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। অয়মারম্ভ শুভায়ঃ ভবতু।

প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্বে ১৩১৭ সালে প্রবীণ নাট্যাচার্য্য এবং তরুণ নাট্যপ্রেমিক যথাক্রমে 'নাট্য-মন্দির' ও 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার সূচনায় তাহাদের প্রয়োজনীতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আজ ১৩৫১ সালে—বর্তমান 'নাট্য-ভারতী'র সূচনাতেও উহাদের অধিকাংশই প্রযোজ্য ; কারণ, উভয় ভূমিকার ছত্রগুলি শাশ্বত সত্যে অনুরঞ্জিত। পত্রিকা দুইখানি যে আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই, তাহাদের কার্যধারাই সে সাক্ষ্য দিয়া থাকে এবং এই গ্রন্থমালার মধ্যেই বর্ত্তমান পাঠক তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়ও পাইবেন। প্রথম কয়েক মাস উভয় পত্রিকার মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎপরে উভয় পক্ষের সুহৃদস্থানীয় কোন বিশিষ্ট নাট্যবন্ধুর প্রচেষ্টায় 'রঙ্গমঞ্চ'

সম্পাদক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া 'নাট্য-মন্দিরে'র ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর মাত্র। কৌতূহলী পাঠকগণ 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রারম্ভে (পৌষ, ১৩১৭) মুদ্রিত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পত্রখানির প্রতিলিপি হইতেই সেই মিলন-গ্রন্থীর সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইবেন। যথা:

'রঙ্গমঞ্চের' সম্পাদক সুকবি ও সুলেখক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে 'নাট্য-মন্দিরে'র সহ-সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইল। আমি যেরূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তাহাতে নাট্যমন্দিরের ন্যায় একখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় গুরুতর দায়িত্ব যথাযথ বহন করিতে হইলে, একজন সুযোগ্য সহকারীর আবশ্যক। মণিলাল বাবু একজন যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁহার সহযোগিতায় নাট্য-মন্দিরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ আশা করা অযৌক্তিক বিবেচনা করি না। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র সুহৃদ্বর সুচিকিৎক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রথম অবগত হই যে মণিলাল বাবু 'নাট্য মন্দিরে'র সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। এ সংবাদ পাইয়া আমি মণিলাল বাবুকে আনাইয়া সযত্নে ও সাগ্রহে সহ-সম্পাদকের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করি। সহৃদয় গ্রাহকবর্গের অবগতির জন্য এ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। বিনীত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'থিয়েটার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। তৎকালে প্রতি সপ্তাহে অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'ষ্টার' থিয়েটারের 'হ্যাণ্ডবিল' প্রায় চৌদ্দ হাজার ছাপাইয়া বিলি করা হইত। উহা তুলিয়া দিয়া নট-নাটক-নাট্যশালা সংক্রান্ত বিবিধ চিত্তাকর্ষক সংবাদের সহিত 'ষ্টার' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্যে 'থিয়েটার' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ইহা বাহির হইত এবং দশ হাজার সংখ্যা শৃঙ্খলার সহিত নিয়মিতভাবে সহর

হইতে সহরতলী অঞ্চলে বিনামূল্যে বিলি করিবার ব্যবস্থা থাকিত। জনসাধারণের অন্তরে নাট্যানুরাগ উদ্বুদ্ধ করিতে এই পত্রিকাখানির প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। হরিদ্রাবর্ণের ডবল-ডিমাই কাগজে মুদ্রিত নাট্যপ্রসঙ্গ ও রঙ্গচিত্রে সুশোভিত সেই পত্রিকাখানি অল্পদিনের মধ্যে এতই জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, উহা সংগ্রহ করিবার জন্য 'ষ্টার' থিয়েটার ও 'থিয়েটার'-কার্য্যালয়ে জনপ্রবাহ বহিত। বিশিষ্ট শ্রেণীর ঐ কাগজখানি সুলভে সরাসরি পাইবার জন্য এজেন্টের মধ্যস্থতায় ইউরোপীয় কোম্পানীর সহিত কনট্রাক্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্বেগময় পরিস্থিতিতে বৈদেশিক কনট্রাক্ট বাতিল হইয়া যায় এবং কাগজের অভাবে কর্তৃপক্ষ 'থিয়েটার' বন্ধ করিতে বাধ্য হন। মাত্র ছয় মাস কাল ইহা স্থায়ী হইলেও নাট্যকলার প্রচার ব্যাপারে জনসাধারণের মনের উপর এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সে-যুগের নাট্যপ্রেমিকগণের অনেকেই অবগত আছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে কাগজ সংগ্রহ সম্বন্ধে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগ হইতে অনুরূপ সমস্যা জটিল হইয়া উঠায় বহু পত্রিকাই বন্ধ হইয়া যায়। ১৯১৫ অব্দে অমরেন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই তিনি কতিপয় নাটকের বিনিময়ে এবং নাট্যকার ও প্রচার-সচিবরূপে নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন—এই সর্ত্তে 'নাট্য-মন্দির' ও তৎসংশ্লিষ্ট ছাপাখানার স্বত্ব-স্বামীত্ব মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করায় তিনিই সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী-রূপে 'নাট্য-মন্দির' পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময়ই অমরেন্দ্রনাথ মণিলাল বাবুর পল্লীভবনে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহার একান্ত আগ্রহে নিজের নাট্যজীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন এবং নাট্য-মন্দিরে তাহা ধারাবাহিকরূপে

প্রকাশিত হইতে থাকে। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও প্রায় দুই বৎসরকাল মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘নাট্য-মন্দির’ নিয়মিতভাবে বাহির করিয়াছিলেন। ‘নাট্য-মন্দিরে’র অমর-সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-বহুল জীবনের বহু কথাই তাঁহার প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ১৯১৭ অব্দে মণিলাল কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীধামে গমন করায় এবং তৎকালে কাগজ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নূতন সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় ‘নাট্য-মন্দির’ বন্ধ হইয়া যায়। কিছুকাল পরে কাশীধাম হইতে তাঁহার উদ্যোগে ‘প্রবাস-জ্যোতি’ পত্রিকা আত্ম-প্রকাশ করিলে তাহাতেও নাট্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত বহু আলোচনার অবকাশ ঘটে। পরবর্ত্তীকালে (বঙ্গাব্দ ১৩৩১) অপরেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় ‘রূপ ও রঙ্গ’ পত্রিকা বাহির করিয়া ‘রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর’ নামে যে জীবন-স্মৃতি লিখিতে থাকেন, তাহাতে স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে বিবৃত ভ্রমাত্মক তথ্যগুলির বিরুদ্ধে উক্ত ‘প্রবাস-জ্যোতি’ পত্রিকাতেই যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে অপরেশ বাবু তাঁহার জীবনস্মৃতি গ্রন্থাকারে মুদ্রণকালে উহার অধিকাংশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাশীধামে বেরিবেরির ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবকালে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও শোকাহত হইয়া মণিলাল বসুমতী-স্বত্বাধিকারী সুহৃদ্বর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সাপ্তাহিক ‘বসুমতী’র সম্পাদন ভারের সহিত দৈনিক ও মাসিকের সেবায় আংশিকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই পরিকল্পনায় সুখপাঠ্য বিবিধ বিষয়-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া উক্ত পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ রূপায়িত হইয়া উঠে। মাসিকের প্রতি সংখ্যাতেই ইহাঁর রচিত সুলিখিত মৌলিক ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কাহিনী এবং ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ নামে বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হইতে থাকে। দৈনিকের ‘আলাপ আলোচনা’ এবং ‘ঐতিহাসিক উপাখ্যান’

মাসিকের 'ছোটদের আসর' তাঁহারই অবদান। সতীশচন্দ্রের সৌজন্যেই সে-যুগের নাট্য-শিল্পী এ-যুগের জনপ্রিয় কথা-শিল্পীরূপে সমাদৃত হন। 'মাসিক বসুমতী'র ছোটদের আসরে 'গল্প দাদু' মৌলিক গল্পধারায় যে রস সৃষ্টি করেন—ছোট বড় সকলেই তাহাতে প্রচুর আনন্দ পান। সেই গল্প দাদু—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে 'নাট্য-মন্দির' পুনঃপ্রকাশিত করিবার শুভেচ্ছা তাঁহাকে প্ররোচিত করে। এই সময় স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সুধীবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র উচ্চশিক্ষিত নাট্যপ্রেমিক শ্রীমান্ হরীন্দ্রনাথ দত্ত অমরেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথকে লইয়া মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হরীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তখন 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত কতিপয় ভ্রমপূর্ণ তথ্য সম্বন্ধে মণিলাল তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলে উভয়েই লজ্জিত হন এবং ভুলগুলি সংশোধন পূর্ব্বক সঠিক সংবাদসহ একটি সংশোধক লিপি লিখিয়া দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মণিলাল বলেন যে, 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকাতেই যথাসময় তাহার উল্লেখ করা যাইবে। নাট্য মন্দিরের পুনঃ-প্রকাশ সংবাদে ইহাঁরা অত্যন্ত প্রীত হন এবং ইহার সেবায় যথাসাধ্য যোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সূত্রেই শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মণিলাল তাঁহার সহায়তাপ্রার্থী হন। হীরেন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত অসুস্থ, শয্যাশায়ী। মণিলালকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। মণিলালের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার সুলিখিত নাট্য-প্রবন্ধগুলি—যাহা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া এককালে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল—'নাট্য-মন্দিরে' প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করিয়া ছাপিবার সম্মতি দেন। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি কালিদাস ও

সেক্সপিয়ার সংক্রান্ত সারগর্ভ প্রবন্ধটি দেখিয়া দেন। সূচনাতেই শ্রেষ্ঠ সুধীর সহানুভূতি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করে।

বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক দাশগুপ্ত কোম্পানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'নাট্যমন্দির' প্রকাশ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় তৎকালে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় :—

প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন চিন্তাশীল নাট্যবিদ্‌গণ নট-নাটক-নাট্যশালা সংক্রান্ত মাল মসলা লইয়া যে অভিনব সাহিত্যসৌধটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা 'নাট্য মন্দির' নামে পরিচিত হয়। উক্ত সৌধে সযত্ন-সঞ্চিত রত্নরাজি শুধু আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ভাণ্ডারেও উপাদান যোগাইতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালা নাট্যশালায় অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় আজ উচ্চ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই সূত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নাট্য-মন্দিরে প্রকাশিত নাট্য-প্রবন্ধসমূহের উপযোগিতা বর্ত্তমান যুগের নাট্যানুরাগীদের পক্ষে অল্প নহে ; বিশেষতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার্থী 'নাটক বিভাগের' ছাত্রগণের পক্ষে ঐ সকল প্রবন্ধ হইতে বহু উপকরণ সংগ্রহেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। তরুণ বয়সেই সাংবাদিক ও নাট্যকাররূপে প্রবীণ নাট্যবিদ্‌গণের সহিত 'নাট্য-মন্দির' রচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব হওয়াতেই তাহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া 'পূর্ব্বপরিচিতকে' বর্ত্তমানের সাহিত্যক্ষেত্রে নবপর্য্যায়ে 'পুনরানয়ন' করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

কিন্তু এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পরেই যুদ্ধের দরুণ নানাদিক দিয়া বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রকাশকগণের পক্ষে পুস্তকের কাগজ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে। শুভানুধ্যায়ী মনীষী হীরেন্দ্রনাথও ইহলোক ত্যাগ করেন, হরীন্দ্রনাথ প্রমুখ উৎসাহ দাতারাও বোমার বিভীষিকায় কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যান। চারিদিকেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও সে সময় ছাপার কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

সহরের অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রচারিত

বিজ্ঞাপনের ফল সক্রিয় হইয়া উঠে। বহু স্থান হইতে নাট্যপ্রেমিক সুধী-বৃন্দের সনির্বন্ধ তাগিদ উদ্যোক্তাগণের উদ্যমকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া তোলে। ফলে, শিক্ষা-জগতের দিকপালস্থানীয় মনীষীদের সুপারিশে মিল হইতে নিয়ন্ত্রিত হারে কাগজ সংগ্রহের অবকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত বামাল্লরির কাগজ-বিভাগের কর্মকর্তা শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হিলজার্স কোম্পানীর শ্রীযুক্ত নিতাই ঘোষ, ভোলানাথ দত্ত প্রতিষ্ঠানের সহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত রঘুনাথ দত্ত এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যরসিক সুধীবৃন্দের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ব্যাপারের পর সর্বসম্মতিক্রমে বিজ্ঞাপিত নাট্য-মন্দিরের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'নাট্য-ভারতী' রাখা হয়। কারণ, বিরাট নাট্য-সাহিত্যের সমন্বয় কল্পে যখন নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং নাট্য-সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দর্ভ সংগ্রহই এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য, সে-ক্ষেত্রে 'নাট্য-ভারতী' নামটির সার্থকতাই বেশী— যদিও পূর্ব প্রকাশিত নাট্য-মন্দির এবং রঙ্গমঞ্চ ইহার অন্তর্ভূক্তরূপেই গণ্য।

এই সূত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নাট্য-মন্দির' বন্ধ হইয়া গেলে, 'রূপ ও রঙ্গ' এবং 'নাচঘর' নামে দুইখানি নাট্য-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে তাহাদের প্রকাশও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে এমন অনেক প্রসঙ্গই ঐ দুইখানি পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে যেগুলি নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার দাবী রাখে। 'নাট্য-ভারতী' তাহাদিগকেও শ্রদ্ধা-সহকারে আহরণ করিতে বদ্ধপরিকর।

বর্তমানে নাট্যানুরাগী সুচিকিৎসক শ্রীযুত বিমল বসুর পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং নাট্যবিদ্ শ্রীযুত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'রূপমঞ্চ' নামে নাট্যসংক্রান্ত যে মাসিক পত্রিকাখানি কতিপয় বর্ষ যাবত সুখ্যাতির সহিত প্রকাশিত হইতেছে এবং তরুণ নাট্যবিদ্ শ্রীমান হিরণ্ময়

দাশ গুপ্তের সম্পাদনায় 'রঙ্গালয়' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে,—'নাট্য-ভারতী' সর্বান্তঃকরণে তাহাদের সহযোগিতা প্রত্যাশী। নাট্য-সাহিত্য বা ইতিবৃত্তরূপে যাহাই গণ্য হইবে, তাহাকেই প্রাধান্ত দিয়া বরণ করিতে নাট্য-ভারতী আগ্রহান্বিত।

অল্প সময়ের মধ্যে সকল ব্যবস্থা চালু করিয়া বর্তমান প্রথম পর্বটির প্রকাশ-ব্যাপারে অনেক খুঁত রহিয়া গিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য, বর্তমান নাট্যশালা ও চিত্রভবনগুলির ইতিবৃত্তমূলক আলোচনা প্রভৃতি সম্ভব হয় নাই। সকল বিভাগে দৃষ্টি রাখিয়া সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পর্বটি নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থমালার উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিতে আমরা সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ করি।

আশা আছে, দেশের এই দুর্দিনে নাট্যশালা, নাট্যকলা ও নাট্য-সাহিত্যালোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আমরা যে মহৎকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নাট্যব্রতী এবং নাট্যানুরাগী দেশবাসীর আনুকূল্য উৎসাহ ও সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইব না। বিনীত—প্রকাশক

নাট্য-ভারতী

প্রথম পর্ব ঃ আষাঢ় ঃ ১৩৫১

নাট মন্দির

কবিশেখর কালিদাস রায়

কত নট এলো কত নট গেলো, কত লীলা নটী সঙ্গে,
কত মৃদঙ্গ ধূলি হয়ে শেষে, মিশে গেল মৃৎ-অঙ্গে।
কত না কণ্ঠ হয়েছে নীরব, কত না নূপুর স্তব্ধ,
কত করতালি বেজে থেমে গেছে, করতাল নিঃশব্দ।
নাট মন্দির ধ্রুব হয়ে আছে, শাশ্বত তার বর্ণ,
নব নব নটনটীর আশায়, উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ।
নীল চাঁদোয়ার রূপের বদল, হয়নিক এক বিন্দু,
দুইটি বর্ত্তী সমানে জ্বলিছে, দিনে রাতে রবি ইন্দু।
বেড়িয়াছে এরে গিরির স্তম্ভ, কূজে পারাবত পুঞ্জ,
বহে ভক্তের নয়নের নদী, চারিপাশে রসকুঞ্জ।
আসে যায় কত গীতি ও নৃত্য, কথকতা, পাণ্ডিত্য,
এরা অনিত্য এরা অধ্রুব, নাট মন্দিরই নিত্য।

নাট্যকলা ও নাট্যশালা

(নট-নাটক-নাট্যশালার ইতিহাস ও আলোচনা)

সূচনায় বলা হইয়াছে, বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করাও 'নাট্য-ভারতী'র অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয়টিও তাহার কার্য্যধারার অন্তর্গত।

কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস এই প্রথম নহে। এই ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে যে-সকল নাট্যপ্রেমিক নানাভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের একটা তালিকা সর্ব্বাগ্রে প্রদান করা আমরা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

(১) ৺**যোগেন্দ্রনাথ বসু**......মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতে বাঙ্গালী স্থাপিত অস্থায়ী সৌখীন নাট্যশালা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মাইকেল বঙ্গীয় নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিতে নাট্যসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কথাগুলিই লিখিত হইয়াছে।

(২) ৺**মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি**......১৩০১-৪ পর্য্যন্ত "পুরোহিত ও অনুশীলন" পত্রে তৎকালের অভিনেতৃবৃন্দের সাহায্যে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর গোষ্ঠীর অভিনয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে এই ইতিহাসের আদি-কালের ঘটনাবলীর কতকগুলি মূল সূত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৩) ৺**ব্যোমকেশ মুস্তফী**......বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বনামধন্য কর্মী, ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রবর্তিত 'বিশ্বকোষ' মহাগ্রন্থের জন্য ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল এবং বিজ্ঞাপন পত্রাদি অবলম্বনে বঙ্গীয় নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

পরবর্তীকালে ইনিই পুনরায় প্রাসঙ্গিক মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং উহা ধারাবাহিকরূপে শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩১৭) প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক চিত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ...বাগবাজার নিবাসী স্বনামখ্যাত সাহিত্য-সাধক ও নাট্যপ্রেমিক। ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবর্তিত 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩০৭) বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্ম ও শৈশবকালের আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত অনুরোধে ২য় বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে বিস্তৃতভাবে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করেন।...৩য় বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় তাহা সমাপ্ত হয়। কিরণবাবু আশৈশব নাট্যানুরাগী। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রথম যখন 'মেঘনাদবধ' নাটক অভিনয় করেন, কিরণবাবু উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররূপে ঐ নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৺অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়..... নাট্যচার্য গিরিশচন্দ্রের শ্রুতিলিপিকার ও কর্মচারীরূপে ইনি 'গিরিশ-গীতাবলী'র পরিশিষ্টে বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তির এক সংক্ষিপ্ত কাহিনী সঙ্কলিত করেন।

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী .. ..হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' পত্রে ইংরাজী ভাষায় যে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথম 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

৺জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর.. ...'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় (১৩১৭ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) ইহাঁর রচিত 'প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে (ইংরাজী

১৯২৪, জানুয়ারী) এ সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত **ডঃ শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামক ইংরাজী প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—See Jyotirindranath Tagore's article প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ পদ্ধতি in the "Rangamancha," an ephemeral Bengali monthly of great interest, which was published in 1909 and Survived only few months. (The Calcutta Review, January, 1924)

৺**গিরিশচন্দ্র ঘোষ**.....নাট্যকার, নাটক ও অভিনেতা, রঙ্গালয়, কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়, কাব্য ও দৃশ্য, প্রসিদ্ধ নট অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নাট্য-পীঠ-শিল্পী ধর্মদাস সুর এবং মহেন্দ্রলাল দত্তের (ট্র্যাজেডিয়ান) জীবনকথা, বহুরূপী বিদ্যা, কাব্য ও দৃশ্য, নৃত্যকলা প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, সেগুলি ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ সকল প্রবন্ধ নাট্যশাল সংক্রান্ত বহু উপাদানে সমৃদ্ধ।

৺**অমৃতলাল বসু**.....পুরাতন প্রসঙ্গে ইনি নিজের নাট্য-জীবনের যে সব কথার উল্লেখ করেন তাহাতে এই ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

৺**দ্বিজেন্দ্রলাল রায়**......'আমার নাট্যজীবন আরম্ভ' এবং 'অভিনেতার কর্ত্তব্য' নামক দুইটি প্রবন্ধ 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই দুইটি রচনায় নাট্যশালার ইতিহাসের বিশেষ কিছু না থাকিলেও বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাট্যজীবন ও অভিনয়-প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়!

৺**ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ**......'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য নট-নাটক-নাট্যশালার আলোচনা ইহার বিষয়বস্তু।

৺**অমরেন্দ্রনাথ দত্ত**......'নাট্যসাহিত্যে নবীনচন্দ্র' এবং 'জীবন স্মৃতি' 'নাট্য-মন্দিরে' প্রকাশিত হয়।

৺**পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়**......নানাদেশীয় নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৺**ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**......'অভিনয়-শিক্ষা' 'গৈরিশী ছন্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ 'নাট্য-মন্দিরে' প্রকাশিত হয়।

৺**মনোমোহন গোস্বামী**......'রঙ্গভূমি ভালবাসিলাম কেন' এই প্রবন্ধে তৎকালের নট-নাট্যকারের জীবনকথার সহিত সমসাময়িক নাট্যশালার পরিচয় পাওয়া যায়।

৺**অতুলকৃষ্ণ মিত্র**......প্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকারের রচিত 'প্রবীনা ও নবীনা' নামক অভিনেতৃ-প্রসঙ্গ 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালের প্রবীনা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত এবং নবীনা অভিনেত্রী তারা সুন্দরীর জীবন-কথায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিকথারও বহু মাল-মসলা পাওয়া যায়।

৺**খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**......প্রসিদ্ধ য়্যাটর্ণী এবং পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তকার, 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় ইঁহার রচিত 'নাট্য-পীঠ-শিল্পী ৺ধর্ম্মদাস', 'নটকুলশেখর ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর' 'বাঙ্গলার আদি নাট্যকার' প্রভৃতি বহু তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়......খগেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা। চন্দন-নগরের বিশিষ্ট অধিবাসী। 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় ইঁহার রচিত 'বাঙ্গলার আদি নাট্যকার' ও 'নাট্য-পরিষদ' নামে দুইটি জ্ঞাতব্য সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়।

৺**সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী**......ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গলার আদি নাট্যকার এবং রঙ্গপুর কুণ্ডির নাট্যপ্রেমিক ভূস্বামী ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রসঙ্গে যে

সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছিলেন, 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়।

৺**রাধামাধব কর**......স্বনামখ্যাত ডাঃ আর, জি, করের ভ্রাতা, সেকালের প্রসিদ্ধ অভিনেতা, 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় ইঁহার রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার আর এক জনক' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—ইনি হইতেছেন ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধামাধব বাবু ইঁহার কাহিনী-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত করেন।

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়...কিছুকাল ইনি দৈনিক 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। 'প্রতীচ্য রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে প্রতীচ্য নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ইনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি ধারাবাহিক রূপে 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুকবি শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী......'রঙ্গালয়' ও 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় নাট্য-কলা সম্বন্ধে ইঁহার রচিত বহু কবিতা ও সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়।

শ্রীহরলাল হালদার......বর্ত্তমানে বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর হরলাল হালদার। ইনি 'রঙ্গমঞ্চ' সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী বন্ধু। সহ-প্রবর্ত্তক-রূপে উক্ত পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ানের নাট্যপ্রীতি এবং তরুণ বয়সে তাঁহার রচিত 'মুখোসধারী পয়গম্বর' নামক নাট্যগল্পটি ইনিই প্রথম বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন এবং তাহা 'রঙ্গমঞ্চে' প্রকাশিত হয়। প্রায় এক যুগ পরে কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে অপর এক লেখক কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া ইহা পুনরায় প্রকাশ পায়।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়......'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ, ইতিকথা, কাহিনী, নাট্যালোচনা

প্রভৃতি নানা আকারে লিখিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরে 'নাট্য-মন্দিরে'র ভার গ্রহণ করিলে দীর্ঘ সাত বৎসর কাল ইঁহার রচিত নাট্য-সাহিত্য এবং নাট্যশালা সংক্রান্ত বহু তথ্য ও কাহিনী উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের দিক দিয়া এই সকল রচনার গুরুত্ব প্রচুর।

এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নট-নাটক-নাট্যশালা সংক্রান্ত উল্লিখিত রচনাবলী হইতে পরবর্তীকালের নাট্যপ্রেমিক লেখকগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনার প্রচুর উপাদান পাইয়াছেন।

১৯০৯ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত প্রায় সাত বৎসরকাল 'নাট্য-মন্দির' নিষ্ঠা সহকারে নাট্য-সাহিত্যের সেবায় অবহিত থাকে। ১৯১৪ অব্দের প্রথমে শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'থিয়েটার' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়। ইহা ছয় মাস মাত্র স্থায়ী ছিল। ১৯১৭ অব্দে শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কাশীধামে কার্য্যান্তরে আত্মনিয়োগ করায় 'নাট্য-মন্দিরে'র প্রকাশও বন্ধ হয়। ফলে, পুরাতন 'রঙ্গালয়' 'রঙ্গমঞ্চ' 'থিয়েটার' ও 'নাট্য-মন্দিরে'র ফাইলগুলি পরবর্তীদের নাট্য-প্রবন্ধ রচনা বা নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থকারে মুদ্রিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, স্বনামখ্যাত মনীষী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ব্যতীত অপর কাহাকেও ঋণ স্বীকার বা বিলুপ্ত পত্রিকাগুলির নামোল্লেখ করিতেও দেখা যায় নাই। ডক্টর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাথমিক ইতিহাস 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লিখিয়া ইহাকে আন্তর্জ্জাতিক মর্যাদা দিয়াছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে 'রঙ্গালয়' 'রঙ্গমঞ্চ' 'থিয়েটার' ও 'নাট্য-মন্দির'

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিয়া প্রতিপন্ন করিব যে, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সৌধটির নির্ম্মাণ-কল্পে উল্লিখিত নাট্যবিদ্‌গণ যে-সকল মাল-মসলা বহুকাল ধরিয়া যোগাড় করিয়াছেন, তাগাড় বাঁধিয়াছেন, ভিত গাঁথিয়া একটা কাঠামো খাড়া করিয়াছেন, প্রায় দুই যুগ পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান কর্মী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন সেই কাঠামোটিকে কঠোর শ্রমসহকারে সেকালের খবরের কাগজে ছাপা উপাদানগুলির সাহায্যে সাজাইয়া সৌষ্ঠবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এ ব্যাপারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে তাঁহার পূর্ব্ববর্তী পরিষদ-কর্মী স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞানসঙ্গত প্রণালীতে সংকলিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লিখিবার ভঙ্গি হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অকপটে লিখিয়াছেন—'ইহাকে আমি পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস বলিতে পারি না এবং অপরেও যেন তাহা মনে না করেন।' তাঁহার সুস্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি যেমন গ্রন্থখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে, এ ব্যাপারে যাঁহারা প্রবর্ত্তক—তাঁহাদের প্রচেষ্টার উল্লেখ করিলে ইতিহাসের সঙ্গতিও বজায় থাকিত বলিয়া মনে করি।

* * * * *

ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র ও হিন্দু নাট্যের উৎপত্তি

ভরত ঋষিই যে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের স্রষ্টা এবং নাট্যকলা ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রবর্ত্তক তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে মহর্ষি ভরতকে অমরাবতীর নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক ও নাট্য-পীঠ-শিল্পী রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিতে' তিনি 'তৌর্য্যাত্রিক সূত্রকার' অর্থাৎ

নৃত্য-গীত-বাদ্য-সমন্বিত সমগ্র সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থকাররূপে অভিহিত। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে নাট্যবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন বলিয়া ব্রহ্মার নির্দ্দেশে ইহা পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভরত ঋষিই উক্ত গ্রন্থের মূল বক্তা এবং গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উত্তম পুরুষে তিনি সংলাপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্রের পুরাতত্ত্ব ঃ

ভরত ঋষির এই নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে বসিলে পাণিনির উল্লেখ করিতে হয়। পাণিনির বিভিন্ন সূত্রে (৪।৩।১০।১১) ইহার প্রসঙ্গ থাকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে অভিনেতৃ-বৃত্তি পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সামাশ্রমী প্রমুখ প্রাচ্য পণ্ডিতবর্গের মতে খৃষ্ট জন্মের তেইশ শত বর্ষ পূর্ব্বে পাণিনীর কাল। পক্ষান্তরে জার্ম্মান পণ্ডিত বুলার (Buller) সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী সোমদেব প্রণীত কথা-সরিৎ-সাগরের একটি উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টের চারিশত বর্ষে পূর্ব্বের লোক বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, বুলার সাহেবের এই সিদ্ধান্ত আজিও গৃহীত হয় নাই। সে যাহা হৌক, পাণিনীর পূর্ব্বেও যে নাট্য-শাস্ত্র ছিল, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ণেল উজ্‌লে মধ্যভারতের সারগুজা প্রদেশে রামগড় পাহাড়ে দুইটি গুহা আবিষ্কার করেন। ইহাতে অশোকাক্ষরে খোদিত লিপিও আছে। ডক্টর ব্লক ঐ গুহা পরিদর্শনে গিয়া খোদিত লিপিগুলিকে নাট্যসংক্রান্ত নির্দ্দেশ বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন। উপরন্তু একটি গুহা মধ্যে একটি প্রস্তরময় রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান যে, উহা খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।* মনুসংহিতার কতিপয় শব্দ প্রসঙ্গে ভরত ঋষির

* উক্ত রঙ্গমঞ্চের সচিত্র বিবরণ 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, 'নট্য-ভারতী'র এই অধ্যায়ে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। সম্পাদক।

নাট্যশাস্ত্র মনুসংহিতা রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনু সংহিতার ন্যায় এই নাট্যশাস্ত্রও বহু প্রাচীন এবং ইহার বিষয়-বস্তু বিশদ ও বিস্তৃত বলিয়া ইহার সাহায্যে সেকালের ভারতবাসীর নানা অবস্থার বিষয় জানিতে পারা যায়। সেকালে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ কিরূপ ছিল এবং ভারতবাসীর জীবনযাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত, মনুসংহিতা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু তৎকালে ভারতবাসী কিভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহার যথাযথ বিবরণ ভরত ঋষির এই নাট্যশাস্ত্র হইতেই জানা যায়। সেকালেও ভারতীয় নাট্যশালা দেশবাসীর মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ মনু ইহা উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার সংহিতায় অত্যন্ত তীব্রভাবে নটবৃত্তিকে দূষিত ও পরিত্যজ্য বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ব্রাহ্মণজাতিকে নটবৃত্তি গ্রহণ করিতে নির্ব্বন্ধ সহকারে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ কৌটাল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, তৎকালে নাট্যশালা ও নটবৃত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় দেশে কুশীলবদের (অভিনেতৃ) সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই গ্রন্থের গদ্যাংশের মধ্যে শ্লোকে রচিত বহুলাংশে আমরা কেবল যে কতকগুলি আসল নাট্যসূত্র পাই তাহা নহে, তাহাদের ভাষ্য, কারিকা, নির্ঘণ্ট এবং নিরুক্তও পাইয়া থাকি। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে এই বৃহৎ শ্লোক-গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে নাট্যকলা সম্বন্ধে একটি বিপুল শাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল এবং সেই শাস্ত্র পাঁচ ছয়টি পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্তরভেদ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং নাট্যকলা সম্বন্ধে সর্ব্বাদৌ যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যে 'অসুর পরাজয়' 'অমৃত মন্থন' 'ত্রিপুর দাহ' প্রভৃতি বহুসংখ্যক নাটক বর্ত্তমান ছিল এবং সেগুলি অতি প্রাচীন-কালে অভিনীত হইত, তাহা অতি সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। সেকালে বহু নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়াই নাট্যশাস্ত্র

প্রণয়ণের আবশ্যক হইয়াছিল। পাণিনি শিলালী রচিত নাট্যসূত্র ও কৃশাশ্ব রচিত নাট্যসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিম্বদন্তী অনুসারে ভরতকেই আদি নাট্যসূত্রকার বলা যায়। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেও বিভিন্ন সিদ্ধান্তবিশিষ্ট নাট্যসূত্রের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে শিলালী, কৃশাশ্ব ও ভরত তিন জনেই বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সূত্রকার ছিলেন। কালে সূত্রগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় এবং ভাষ্য সকল লিখিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই শাস্ত্রে গ্রন্থসংখ্যা বিপুল হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কারিকা, সংগ্রহ, নির্ঘণ্ট ও নিরুক্তাদি লিখিত হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বিরাট নাট্যশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া সকল বিষয়ের সুসঙ্গত সমাবেশ করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়, তাহাই এই ভরত-নাট্যশাস্ত্র।

এই গ্রন্থ ৩৮ অধ্যায়ে বিস্তৃত। ইহাতে পারিভাষিক শব্দ এত আছে যে, তাহাদের সদর্থ অনুধাবন করিতে বহু বৎসর গবেষণা ও অনুশীলন আবশ্যক। ২৮শ অধ্যায়ে কতকগুলি সূত্র পাওয়া যায়, তাহা যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি অধ্যায় আছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল সুপ্রাচীন পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সঙ্গীতশাস্ত্র রচয়িতৃগণেরও দুর্ব্বোধ্য, সাজসজ্জা ও অভিনেতৃনির্ব্বাচন এবং নাটকের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে যে সকল অধ্যায় আছে, সে সকলও ঐরূপ দুষ্প্রবেশ্য। এই গ্রন্থে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, অভিনেতাদিগেরও তাহাই প্রয়োজনীয়, সুতরাং সে কালে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে যে কোন শিল্প ও কলা অনুষ্ঠিত হইত, তাহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই এই গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে; কাজেই যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাই বিশেষভাবে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহার সকল স্থানের অর্থভেদ করা সহজ সাধ্য নহে।

সর্ব্বত্র ভরত উত্তমপুরুষের বাক্যপ্রয়োগে বিষয়সমূহ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারই লিখিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে দৈবভাবের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে এবং দেবতার অভিনয় করিতে হইলে, মানুষের ভাবেই অভিনয় করিতে হইবে। অথচ তিনি বলেন যে তাঁহার এই নাট্যবিদ্যার উৎপত্তি স্বর্গে এবং দেবতারা, অপ্সরাগণ এবং অন্যান্য দেবযোনিই তাঁহার অভিনেতৃমণ্ডল। যখন এই সকল দেব-অভিনেতা কলাকুশল ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহারা আপনারা নাট্যরচনা করিতে লাগিলেন, আর সেই সকল নাট্যে ঋষিদিগকে বিদ্রূপ করা হইতে লাগিল। ঋষিরা ক্রোধে তাঁহাদিগকে দুইটি শাপ দিলেন,—তাঁহারা শূদ্রাচারী হইবেন ও তাঁহাদের এই দুষ্ট বিদ্যা লোপ পাইবে। ভরত তখন মধ্যস্থ হইয়া ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিয়া বিদ্যালোপের অভিসম্পাত প্রত্যাহার করাইলেন। প্রথম শাপ বজায় রহিল।

নহুষের রাজত্বের অল্পকাল পরে, চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা স্বর্গ জয় করিয়া স্বীয় পার্থিব রাজধানীতে নাট্যাভিনয় করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ভরত ঋষি অভিনেতৃবর্গের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন, অভিনেতৃবৃন্দ পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন এবং এখানে কিছু দিন থাকিয়া এক দল প্রজা উৎপাদন করিয়া গেলেন, ইহাদের বংশগত বৃত্তিই হইল নাট্যাভিনয়। কৌটিল্য তাঁহার অর্থ শাস্ত্রে এই জাতিকে শূদ্র শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন, দেব-অভিনেতৃবর্গ তৎপরে স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন এবং নাট্যকলার গুণপণা প্রকাশের জন্য ভরতের দ্বারা শাপমুক্ত হইলেন। ভরত নিজে পৃথিবীতে আসেন নাই। কোলাহল (কোথাও 'কোহিল', কোথাও 'কোহল' নামে উল্লিখিত) এক ব্যক্তিই মনুষ্যলোকের আদিশিক্ষক।

"আপ্তোপদেশসিদ্ধং হি নাট্যং প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
শেষং প্রস্তাবতন্ত্রেণ কোলাহল কথিষ্যতি ॥
প্রয়োগান্ কারিকাশ্চৈব নিরুক্তানিতথৈব চ।
অপ্সরোভিরিদং সার্দ্ধং ক্রীড়নীয়েকহেতুকম্ ॥"

পুনরায়

"ভরতানাঞ্চ বংশয়োঽয়ং ভবিষ্যঞ্চ প্রবর্ত্তিতঃ।
কোহেলাদিভিরেবস্তু ব্যাসশাণ্ডিল্য ধূর্ত্তিতৈঃ ॥
মর্ত্ত্যধর্ম্মক্রিয়াযুক্তৈঃ কিঞ্চিৎকাল মবস্থিতৈঃ।
এতচ্ছাস্ত্রং প্রণীতং হি নরাণাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥"

ভরত সরল ভাবে সূত্রের পরিবর্তে শাস্ত্ররচনার কর্তৃত্ব বাৎস্যকোহেল, শাণ্ডিল্য ও ধূর্ত্তিতকে প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত দেশ ও জাতির উল্লেখ দেখা যায়,—(১) কিরাত, (২) বর্ব্বর, (৩) অন্ধ্র, (৪) দ্রাবিড়, (৫) কাশী-কোশল, (৬) পুলিন্দ এবং (৭) দাক্ষিণাত্য। এই সকল দেশের লোকচরিত্র যদি নাটকে অভিনয় করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইতে হইবে। (৮) শক, (৯) যবন, (১০) পহ্লব, (১১) বাহ্লীক,—এই কয় দেশের লোক শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইবে। (১২) পাঞ্চাল, (১৩) শৌরসেন, (১৪) মাহিষ, (১৫) উড্র-মগধ, (১৬) অঙ্গ, (১৭) বঙ্গ, এবং (১৮) কলিঙ্গ দেশের লোকদিগকে মলিন-শ্বেত (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে) রঞ্জিত হইতে হইবে। এই সম্পর্কে যে সকল জাতির উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তাহারা সকলে সুপ্রাচীন কালে বর্ত্তমান ছিল। অন্ধ্র ও কলিঙ্গদিগের উল্লেখ অশোক-লিপিতে পাওয়া যায়। বঙ্গগণের উল্লেখ বুদ্ধের জীবন চরিতে আছে। পাঞ্চাল ও শৌরসেনদিগের উল্লেখ বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়, আর শক, যবন ও পহ্লবদিগের কথা মনুতে আছে।

ঐ সকল বিভিন্ন দেশের লোকদিগের নাট্যরীতির উল্লেখ-কালে

নাট্যশাস্ত্র চারিটি বিভিন্ন রীতির উল্লেখ করিয়াছেন ;—দাক্ষিণাত্য, আবন্তি, উড্র, মাগধি ও পাঞ্চাল মধ্যম ; দক্ষিণাপথ, কোশল, তোষল, মোশল, কালিঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, বনীয় বা বনবাস দেশের লোকেরা দাক্ষিণাত্য রীতির , অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র, মালব, সিন্ধু, সৌবীর, আনর্ত্ত, অর্বদ, দশার্ণ ও মৃত্তিকা দেশের লোকে আবন্তী-রীতির ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস উড্রমগধ, পৌণ্ড্র, নেপাল, অন্তর্গিরি, বর্হির্গিরি, মলচ, মল্লবর্ধক, ব্রহ্মোত্র, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বিদাহ, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ ও প্রবীতী দেশের লোকে উড্র-মাগধী রীতির এবং পাঞ্চাল, কাশ্মীর, সৌরসেন, হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, শাকল, মদ্র, কৌশীনর এবং হিমালয়গর্ভস্থ গঙ্গার উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী জাতিসমূহ পাঞ্চাল মধ্যমরীতির অভিনয় প্রিয় ছিল। এই সকল দেশও প্রাচীন-কালে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণাপথের উল্লেখ কল্পসূত্রে, কোশলের উল্লেখ ব্রাহ্মণে, তোষল ও কলিঙ্গের উল্লেখ অশোকলিপিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীতে সলোমন যে দ্রাবিল বা সামিল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দ্রাবিড় নামের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছু নহে। অন্ধ্র এবং মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতরূপ অশোক লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ সকল দেশের নামই প্রাচীনকালে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল তিন চারিটি নাম মাত্র নূতন।

এই গ্রন্থে ভাষার—বিশেষতঃ প্রাকৃত ভাষার উল্লেখকালে নিম্নোক্ত সাতটিকে 'ভাষা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—(১) মাগধী, (২) অবন্তীজ, (৩) প্রাগ্য, (৪) শূরসেনী, (৫) অর্দ্ধমাগধী, (৬) বাহ্লীকা (৭) দাক্ষিণাত্য এবং নিম্নোক্ত ছয়টিকে 'বিভাষা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে,—(১) শবারী, (২) আভীরা, (৩) চাণ্ডালী, (৪) শাকরী, (৫) দ্রাবিড়ী ও (৬) উর্দ্ধরাজ। সেকালে প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে সংস্কৃত মূলক নহে, এরূপ ভাষা এই শেষোক্ত ছয়টি হইতে জানা যায়।

বহুপরে কর্ণাটী দ্রাবিড়ী ও অন্যান্য ভাষাগুলিকে প্রাকৃত ভাষার তালিকায় লওয়া হইয়াছিল।

এই গ্রন্থখানি যে অতি প্রাচীনকালে রচিত,—তাহার আর এক নিদর্শন,—

"ন বর্ব্বরকিরাতান্ধ্‌ দ্রাবিড়াদ্যাসুজাতিষু।
নাট্যযোগে তু কর্ত্তব্য কাব্যং ভাষা সমাশ্রয়ম্‌॥"

অর্থাৎ ঐ সকল জাতির ভাষা সাধারণের বোধ্য ছিল না বলিয়া উহা পরিত্যাগ করা হইত।—এই গ্রন্থে যে ভূগোল জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এবং ভাষাবিভাগের বিবরণ দ্বারাও এই গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

নাট্যকলার উৎপত্তি ঃ

গ্রন্থের এক স্থানে কথিত আছে যে বৈবস্বত মনুর দ্বিতীয় যুগে বর্ব্বরতার প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় লোকসমাজ নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া লোক হিতার্থে এমন এক আমোদ ও শিক্ষাপ্রদ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিলেন যাহাতে অশিক্ষিত শূদ্রগণও উপকৃত হইতে পারে। ব্রহ্মা তখন চারি বেদকে স্মরণ করিলেন। বেদচতুষ্টয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে দেবতাদের প্রার্থনা জানাইয়া আর এক পঞ্চম বেদ সৃষ্টির নিমিত্ত তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ঋগ্‌বেদ তাঁহাকে সংলাপ প্রণালী (Dialogue) সামবেদ গান (Song) যজুর্ব্বেদ অভিনয় (Acting) · এবং অথর্ব্ব বেদ ভাব (Emotions) দান করিল। এই ভাবে পঞ্চম বেদ-রূপ নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে এই শাস্ত্রের প্রথম আচার্য্যপদে বরণ করিয়া কহিলেন—'ইন্দ্রধ্বজ রোপনোৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী, এই উৎসবে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় দিবার উত্তম সুযোগ

উপস্থিত।’ ভরত প্রথমেই অনুষ্ঠানিক পূজার্চ্চনা ব্যবস্থা করিয়া অন্যান্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিলেন। অতঃপর উৎসবের দিন মহাসমারোহে একখানি নাটক অভিনয় করাইলেন। উহাতে দেবগণ কর্ত্তৃক অসুর-বিজয় বর্ণিত হইয়াছিল। * অভিনয়ে দেববৃন্দ অতিশয় প্রীত হইলেন। এবং প্রত্যেকেই নাট্যশালার প্রয়োজনীয় কোন না কোন বস্তু উপহার প্রদান করিলেন। অসুরেরা কিন্তু উহাতে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও উৎপীড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই দেবতারা আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। ফলে তাহারা উত্তেজিত হইয়া অভিনয়-কালে নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়া এমন আনন্দময় অভিনয়োৎসবটি পণ্ড করিতে প্রয়াস পাইল। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্থাপিত ইন্দ্রধ্বজটি উৎপাটন পূর্ব্বক তাহার সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় দণ্ডাঘাতে বিঘ্নকারী অসুরগণকে জর্জ্জরিত করিলেন। এই ঘটনা হইতেই ইন্দ্রধ্বজকে ‘জর্জ্জর’ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। অতঃপর এই ‘জর্জ্জর’ অর্থাৎ ইন্দ্রধ্বজ নাট্য-শালার ‘লাঞ্ছন’ (Emblem) স্বরূপ হইয়া প্রত্যেক অভিনয়ের প্রারম্ভে অর্চ্চনার প্রধান প্রতীকের মর্য্যাদা পায়। এই পবিত্র অর্চ্চনীয় বস্তুটি ছয়টি গ্রন্থী ও পঞ্চ পর্ব্বে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক পর্ব্ব এক একটি

* শুনা আছে,—ভরতের এবং ভারতের এই আদি নাটকের নাম ‘লক্ষ্মী স্বয়ম্বর’। সমুদ্র-মন্থনের পর লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের মিলন ও অমৃত বণ্টন উপলক্ষে দেবাসুরের যুদ্ধ এবং অসুরগণের পরাজয়ই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কেহ যদি এই আদি নাটকের বিবরণ বিশেষরূপে প্রমাণাদিদ্বারা লিখিয়া পাঠান,—তিনি পুরস্কার বা পারিশ্রমিক যাহা আশা করেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হইবে। “রং”—সম্পাদক। আশ্বিন, ১৩১৭। উক্ত নাটক সম্বন্ধে ১৩১৭ অব্দে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমানেও (আষাঢ়—১৩৫১ অব্দে) তাহা পুনরুক্তি করা যাইতেছে।—‘নাট্য-ভারতী সম্পাদক।

দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া সেগুলিকে অধিকারী দেবতার বাঞ্ছিত বর্ণানুযায়ী রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা মণ্ডিত করা হয়। এই জর্জ্জর দৈর্ঘ্যে অষ্টোত্তরশত অঙ্গুলি অর্থাৎ ৭২ ইঞ্চি বা ৬ ফুট। এই জর্জ্জর-দণ্ড যে কোন কাষ্ঠেই প্রস্তুত হইতে পারে, তবে বংশদণ্ডই প্রশস্ত। এই বংশদণ্ডের প্রশস্ততা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের যে-অংশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে সেই প্রদেশেই নাট্যকলার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল।

নাট্যে নৃত্যের সংযোজনা :

যাহাহৌক, বিঘ্নবাধা কাটাইয়া প্রথমাভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেবতাদের উৎসাহ স্ফীত হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা শিবকে তাঁহাদের নাট্যাভিনয় দেখাইয়া প্রীত করিতে সচেষ্ট হন। ফলে হিমালয় প্রদেশে শিব সম্মুখে দ্বিতীয় অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এবার 'ত্রিপুরদাহ' নামে আর একখানি নাটক প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে দুর্দ্ধর্ষ ত্রিপুরাসুরের বিরুদ্ধে শিবের অভিযান এবং শিবশূলে তাহার সংহার। অভিনয় দর্শনে শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উহাতে নৃত্য সংযোগের প্রস্তাব করিলেন। *

* শুধু প্রস্তাব নহে শিবই নৃত্যের পরিকল্পনা ও প্রবর্ত্তনা দ্বারা নাট্যকে সমৃদ্ধ এবং সর্বশ্রীমণ্ডিত করেন। 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার সূচনায় 'নটনাথ' প্রশস্তিতে সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে তাহা কথিত হইয়াছে। যথা—দেবাদিদেব মহাদেবই পুরাণে 'নটনাথ' 'নটেশ' 'নর্ত্তক' নামে বর্ণিত। তাঁহারই নৃত্য হইতে জগতে নৃত্যের বিকাশ, তাঁহারই গানে সঙ্গীতের উৎপত্তি, তাঁহারই ডমরুধ্বনি হইতে স্বরব্যঞ্জনাদি ধ্বনিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শিবের নৃত্যকালে তাঁহার জটাজুট উর্দ্ধমুখ হইয়া উঠিত, জটাজুটমধ্যস্থা গঙ্গা চারিদিকে বহুধারে ছড়াইয়া পড়িতেন এবং নৃত্যের বেগে তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিত! —(রঙ্গমঞ্চ, ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ; শ্রাবণ ১৩১৭)—'নাট্য-ভারতী'—সম্পাদক

শিবের নির্দ্দেশ মত নাট্যাচার্য্য ভরত পরবর্ত্তী নাট্যাভিনয়ে নৃত্যের ব্যবস্থা করিলে মুনিগণ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নাটকাভিনয়ে নৃত্য সংযোগ কেন করা হইল? ইহা যখন উপাখ্যানকে বর্দ্ধিত করে না বা বৃত্তি-বিকাশেও সাহায্য করে না,—অভিনয়-কলাই তৎপক্ষে যথেষ্ট, তখন নাটকে উহার সার্থকতা কি? উত্তরে ভরত বলিলেন—নাটকীয় কলাকৌশল প্রকাশে নৃত্যের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু উহাকে শোভাময় করে। নৃত্য সাধারণের অতি প্রিয়, সকল উৎসবেই লোকে নৃত্যের অনুষ্ঠান করে, এইসব কারণেই নাটকাভিনয়ে গানের সংস্রবে নৃত্য সংযুক্ত হইয়াছে।

স্থায়ী নাট্যশালা এবং অভিনেয় নাটকের নব ব্যবস্থা :

হিমালয়ে শিবের সম্মুখে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও 'ত্রিপুরদাহন' নাটকের ব্যাপারে অসুরবিদ্বেষ থাকায় তাহা অসুরগণের প্রীতিপ্রদ ত হইলই না উপরন্তু এখানেও তাহারা তলে তলে বিঘ্ন ঘটাইতে সচেষ্ট ছিল। নাট্যাচার্য্য ভরত ইহাতে অত্যন্ত ব্যাথা পাইলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে অভিনয়ে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে এবং দেবাসুর উভয়পক্ষই প্রসন্ন ভাবে অভিনয়ানন্দ উপভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন মহাশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া স্থায়ী-ভাবে এক নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। এই সঙ্গে এক সভায় অসুরগণকে আহ্বান করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া, লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই এই নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অভিনয় মনে করিয়া আনন্দ উপভোগ করা উচিত, ক্রুদ্ধ হইয়া অভিনয় পণ্ড করিবার প্রয়াস অত্যন্ত অন্যায় এবং অশোভন। অসুরগণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ উঠিল যে, দেবাসুর যুদ্ধে অসুরদের পরাজয় ব্যাপার-গুলিই ক্রমাগত অভিনয় দ্বারা প্রদর্শন করাতেই ত এই অনর্থ ঘটিয়াছে। অভিনয় হইলেও অভিনয়ের মধ্যে জাতির অপমান দেখিয়া কে স্থির

থাকিতে পারে? তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে নাটকে আর অসুরদের পরাজয়সূচক অপমান এবং দেবতাদের জয়সূচক গৌরব প্রদর্শিত হইবেনা।

অভিনয় গৃহ—প্রেক্ষাগার ও রঙ্গমঞ্চ :

নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিনয় গৃহ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এইরূপ :

প্রথম প্রকার গৃহের নাম 'বিকৃষ্ট'; ইহা আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি, দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত। এইরূপ নাট্যশালা দেবতাদিগের অর্থাৎ দেবমন্দির সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার গৃহও আয়তাকার ৬৪ হাত দীর্ঘ এবং ৩২ হাত প্রস্থ; ইহা রাজা ও রাজন্যবর্গের জন্য। শাস্ত্রে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই শ্রেণীর নাট্যশালাই জনবহুল স্থানে সাধারণের জন্য ব্যবস্থিত হইত। তৃতীয় প্রকার নাট্যশালা সমভুজ ত্রিকোণাকার, প্রত্যেক ভুজের পরিমাণ ৩২ হাত; ইহা গার্হস্থ্য নাট্যশালা। উল্লিখিত নাট্যশালাগুলির ঠিক অর্দ্ধাংশ দর্শকদিগের বসিবার জন্য থাকিত। বিভিন্নজাতির বসিবার জন্য বিভিন্ন স্থান থাকিত এবং তাহা বিভিন্নবর্ণের স্তম্ভের দ্বারা বিভক্ত করা হইত। আসনগুলি একের পশ্চাতে আর একটি সোপানাকারে সজ্জিত হইত। প্রত্যেক আসন তাহার সম্মুখের আসন অপেক্ষা একহাত উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইত। সম্মুখের আসনে ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিতেন এবং তাহা শ্বেতবর্ণের স্তম্ভদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। ক্ষত্রিয়দিগের আসনগুলি রক্তবর্ণ স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা চিহ্নিত করা হইত। ইহাদের পশ্চাতে উত্তর-পশ্চিমে বৈশ্যগণের এবং উত্তর-পূর্ব্বে শূদ্রগণের আসন থাকিত। বৈশ্যগণের আসনের চিহ্ন পীতবর্ণের এবং শূদ্রগণের আসনের চিহ্ন নীল বর্ণের স্তম্ভশ্রেণী। এতদ্ভিন্ন অন্যবর্ণের কতকগুলি স্তম্ভ থাকিত ও তাহাদের পার্শ্বে যে সকল আসন থাকিত, তাহাতে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত ব্যক্তিরা বসিত। এই দর্শকস্থানের ঊর্দ্ধে এক বারাণ্ডা থাকিত, সেখানেও

পূর্ব্বোক্তরূপে চিহ্নিত আসনাদি থাকিত। নাট্যশালার অপরার্দ্ধ স্থান অভিনেতৃগণের অধিকারে থাকিত। এই ভাগে সর্ব্বপশ্চাতের অংশের নাম 'রঙ্গশীর্ষ'। এই অংশটি ছয়টি স্তম্ভের সমন্বয়ে পুরীর এক অষ্টমাংশ স্থান অধিকার করিত। নাট্যবেদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতার পূজার জন্য এই অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নেপথ্যগৃহ বা সজ্জাগৃহ হইতে এইস্থানে আসিবার দুইটি দ্বার এবং নেপথ্য হইতে রঙ্গমঞ্চে আসিবার জন্য কোথায় একটি কোথাও বা দুইটি দ্বার হইত। রঙ্গমঞ্চ কখন কখন দ্বিতলরূপে নির্ম্মিত হইত। দ্বিতলে রঙ্গমঞ্চের উপরিতলে স্বর্গের দৃশ্যাবলী অভিনীত হইত। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ বস্ত্রের উপর অঙ্কিত উদ্যান, অট্টালিকা প্রাসাদ, মন্দির, নদী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির ছবিদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকিত। এই সকল ছবিদ্বারা পরিবর্ত্তন ও অপসারণ যোগ্য দৃশ্যাবলীর অভাব দূর হইত।

নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বরঙ্গ :

নাট্যশাস্ত্রে নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বানুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে : (১) বাদ্যযন্ত্রাদির আয়োজন, (২) স্বদলের মধ্যে বাদকদিগের অবস্থিতি স্থান, (৩) সঙ্গীতারম্ভ, (৪) বাদ্যপরীক্ষা, (৫) কণ্ঠস্বরের সহিত যন্ত্রস্বরের মিলন, (৬) তন্ত্রযন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গতি সাধন, (৭) বিবিধ যন্ত্রে বাদকগণের হস্ত সংযোগ, (৮) বিভিন্ন যন্ত্রের সুর সমন্বয় দ্বারা একতান বাদন, (৯) তাল বিধান ও (১০) ঈশ্বর স্তোত্র গান। এই সকলের ব্যবস্থাই রঙ্গমঞ্চের বাহিরে যবনিকার অন্তরালে করিতে হইবে। তৎপরে দুইপার্শ্ব দিয়া যবনিকা উঠিয়া গেলে দুইজন অনুচর সহ পুষ্পাঞ্জলি হস্তে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দশদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দশদিক্‌পালকে প্রণাম করিবেন। অনুচরদ্বয়ের একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার এবং অন্যের হস্তে জর্জ্জর থাকিবে। ব্রহ্মাদি দেবতাদের যথারীতি অর্চ্চনার পর সূত্রধার সুপ্রসিদ্ধ নান্দীপাঠ এবং কয়েকটি শ্লোকে জর্জ্জর স্তোত্র পাঠ

করিবে। তাহার পর অঙ্গভঙ্গী ও বাগভঙ্গী সহকারে সূত্রধার নান্দী পাঠ করিবে। প্রত্যেক বাক্যের পরই অনুচরেরা 'নবমৃত্বার্য্য' (আর্য্য, তাহাই হউক) বলিবে। তৎপরে বাদ্যকরেরা অষ্টতালবিশিষ্ট নয়টি গুরু, ছয়টি লঘু এবং পুনরায় তিনটি গুরু অক্ষরযুক্ত সুর বাদন করিবে। ইহার দ্বারা জর্জ্জর স্তব পাঠ সূচিত হইবে। তৎপরে গম্ভীর স্বরে অভীপ্সিত দেবতার স্তোত্র পাঠ, রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন ও উপসংহারে জর্জ্জর-বিসর্জ্জন সূচক কবিতা পাঠ করিয়া জর্জ্জরকে ভূমিতে রাখিয়া দিবে। তৎপরে অনুচরেরা সরিয়া দাঁড়াইলে সূত্রধার জর্জ্জরের ভারকেন্দ্র নির্ণয় করিয়া সেই স্থান ধারণ করতঃ সুকৌশলে সুদৃশ্যভাবে অনুচরগণের দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া আদিরসাত্মক একটি আর্য্যাশ্লোক পাঠ করিবে। এই পঞ্চপদী কৌশলময় গমনের নাম 'চারী'। তৎপরে অনুচরের হস্তে জর্জ্জর দান করিয়া সূত্রধার দ্রুত ও তীব্রগতি গান-বাদ্যের সহিত রঙ্গমঞ্চে পরিভ্রমণ করিবে এবং কোন তীব্ররসাত্মক শ্লোক পাঠ করিবে। ইহাকে 'মহাচারী' বলে। ইহার পর সূত্রধার অনুচরগণের সহিত আলাপ করিবে। এই আলাপের নাম 'প্ররোচনা' বা আগ্রহ উন্মেষ। ইহাতে দর্শকবৃন্দের অভিনন্দন, নাটক দর্শন ও শ্রবণার্থ আমন্ত্রণ ও নাটকের কথা উল্লেখ থাকিবে ; তৎপরে যে ভাবে প্রবেশ করা হইয়াছিল সেই ভাবে সানুচর প্রস্থান করিবে।

এই সকল মুখবন্ধের ব্যাপার অতিদীর্ঘ হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে অভিনেতৃগণ ও দর্শকগণ অধীর হইয়া উঠিতে পারেন। তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িলে অভিনয়ের রস গ্রহণ করা দুর্ঘট হইবে। সানুচর সূত্রধার রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিলে, আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, ইহার নাম 'স্থাপক'। এই ব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকারম্ভ করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তি সুদৃশ্য ও মনোহরভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে দেবতাদিগের মহিমা কীর্ত্তন, দর্শকগণের প্রশংসা, কবির কৃতিত্ব জ্ঞাপন করিবে। এই

ব্যক্তির উক্তির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপযুক্ত তানলয়ে বাজনা বাজিতে থাকিবে। অবশেষে এই ব্যক্তি নাটকের সূচনা উল্লেখ করিয়া প্রস্থান করিবে।

ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতের নাট্যশালা ও নাট্যকলার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল, তাহা হইতে সেকালের রঙ্গমঞ্চ নাটক অভিনয় সঙ্গীতাদি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাষ পাওয়া যায় এবং সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বর্ত্তমানের নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয় ব্যবস্থার তুলনায় তাহা অনেকাংশে উন্নতই ছিল। *

প্রাচীন ভারতের নাট্যশালা

মধ্যভারতে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত লক্ষণপুর এষ্টেটের মধ্যে রামগড় পর্ব্বত অবস্থিত। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের খরসিয়া ষ্টেসন হইতে এই স্থানটির দূরত্ব একশত মাইল মাত্র। রামগড় পাহাড়টির সর্ব্বোচ্চ চূড়া দুই হাজার ফুটেরও অধিক। পর্ব্বতাধিপতি দেবতা রঘুনাথ, বৃহৎ এক মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর মন্দিরে বিরাট মেলা বসে এবং মধ্যভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই দেবমন্দিরের জন্যই পর্ব্বতটি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট বিশেষ পরিচিত। এই পর্ব্বতটির উত্তরভাগে দুইটি গুহা আছে এবং এই স্থানে পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া একটি স্বাভাবিক সুড়ঙ্গপথ পাওয়া যায়। এই পথ ১৮০ ফুট দীর্ঘ এবং এত উচ্চ যে আরোহী সহ একটা হাতী অনায়াসে উহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সুড়ঙ্গটি 'হাতীপোল' নামে সুপরিচিত। পশ্চিম দিকে পর্ব্বতটি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ঘন জঙ্গলাবৃত উপত্যকার, পশ্চিম পার্শ্বেও এই পর্ব্বতের আর এক অংশ সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। (আশ্বিন, ১৩১৭)

পূর্ব্বোক্ত গুহা দুইটিই পশ্চিমদ্বারী। উহার উত্তরের গুহার নাম 'সীতাবেঙ্গা' এবং দক্ষিণাংশের গুহার নাম 'যোগীমায়া' গুহা। উভয় গুহাতেই কয়েক পংক্তি লিপি খোদিত আছে।

গত ১৩০১ সালের গ্রীষ্মকালে ডক্টর ব্লক এই গুহা ও লিপিগুলি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে গেসলার এবং বল সাহেব এই গুহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং এখানকার প্রাচীনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ডক্টর ব্লক নিজে গুহা দুইটির ফটো-গ্রাফের সহিত খোদিত লিপির প্রতিলিপি লইয়া আসেন এবং তাহা হইতেই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রথম গুহাটি খৃষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে নাট্যশালারূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই গুহাদুটিকে যোগী সন্ন্যাসীদের আবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর ব্লক বলেন, এস্থলে ঐরূপ যোগীদের বাস হওয়া অসম্ভব। গুহাগুলির অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক ভিতরের ব্যাপারগুলির ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, এখানে কবিতার আবৃত্তি, গাথাপাঠ, সঙ্গীত এবং নাটকাদির অভিনয় হইত। গুহাগাত্রে খোদিত লিপিগুলির অক্ষরের আকার প্রকার দর্শনে অশোক লিপিতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী অক্ষরের শ্রেণীতেই সহজে গণ্য করা যায়। এই অক্ষরের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাকে খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় নাট্যশালার অবশেষ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

প্রথমোক্ত সীতাবেঙ্গা গুহায় প্রবেশ করিয়াই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খোদিত কতকগুলি বেঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। বেগলার ঐগুলিকে সোপান-শ্রেণী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্লক বলেন, সোপান হইলে গুহামুখের সমস্ত অংশ জুড়িয়া উহা খদিত হইত না, বা দক্ষিণাংশে যেখান দিয়া গুহায় প্রবেশ করিবার পথ নাই, সেদিকে উহা মোটেই থাকিত না। এতদ্ভিন্ন উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে যে সকল নালার ন্যায় স্থান দেখা

যায়, সেগুলি পয়ঃপ্রণালী হইতেই পারে না ; কারণ সেগুলির মুখ কোন দিকে খোলা নহে, কাজেই বৃষ্টির জল এই নালাগুলির দ্বারা বাহির না হইয়া জমিয়া থাকিতে পারে। ঐগুলিকে দর্শকের আসন বলিয়া অনুমান করিলে বেশ বুঝা যায়। এই সকল আসনে বসিয়া সম্মুখে যাহা কিছু ব্যাপার ঘটে, তাহা দেখিবার বেশ সুবিধা হয়।

সম্মুখের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানটি নাট্যমঞ্চ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় এবং বেঞ্চগুলিতে পঞ্চাশজন বা ততোধিক দর্শকের স্থান হইতে পারে। গুহাগর্ভটি ৪৬ ফুট দীর্ঘ এবং ২৬ ফুট প্রস্থ। উহার তিন দিকেই বেঞ্চ আছে। এই বেঞ্চগুলি উচ্চে আড়াই ফুট, ৭ ফুট চওড়া এবং সম্মুখের দিকে ঢালু। দ্বারের নিকট তলদেশ কিছু বেশী নিম্ন। গুহা প্রবেশের দ্বারের নিকট উভয় পার্শ্বে গুহাতলে দুইটি গর্ত্ত আছে। উহাতে পর্দ্দা খাঁটাইবার জন্য কাঠের খুঁটি লাগানো হইত। শীতকালে দর্শকেরা ভিতরে বসিলে এই পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া হইত। শীতল বাতাসে লোকের কষ্ট হইত না। এরূপস্থলে দর্শকেরা সোপানশ্রেণীর ন্যায় আসনগুলিতে বা ঐ চওড়া বেঞ্চে বসিত এবং পর্দ্দার সম্মুখে নৃত্যগীত ও অভিনয়াদির ব্যবস্থা হইত। * * *

সীতা বেঙ্গা গুহায় খোদিত নিম্নলিখিত লিপি পাওয়া যায়—

আদী পয়ন্তী হৃদয়ম্...।
সভাগ গরু কবয়ো এ রাতয়ম্···।
দুলে বসন্তীয়া হাসাবানুভূতে
কুতস্কটম এবং অলম গ

ডক্তর ব্লক লিপিগুলির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—কবিরা স্বভাবতঃ মাননীয় হৃদয়কে দীপিত করেন—তাঁহারা···। বাসন্তী পূর্ণিমায় দোলযাত্রায় যখন গীতিবাদ্য ও রসালাপ চতুর্দ্দিকে চলিতে থাকে, জনগণ তখন যূথিকা মাল্যধারণে স্ফীত হয়।

যোগীমায়া গুহায় নিম্নলিখিত খোদিত লিপি আছে—

(১) সুতনুকনক্ষ (২) দেবদাসীক্য (৩) সুতনুকনাম দেবসিক্যি (৪) তম্ কময়িথবল ন শেয়ে। (৫) দেবদিনে নম। রূপদখে।

ব্লক সাহেব লিপিগুলির এরূপ অর্থ করেন—

(১) সুতনুকা নামে (২) এক দেবদাসী (৩) সুতনুকা নামে এক দেবদাসী (৪) বালাদিগের নিমিত্ত এই আবাস করেন। (৫) দেবদিন্ন নামে চিত্রকর ছিলেন।

অপর গুহার লিপির সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে প্রথম গুহায় নাট্যশালা ছিল এবং এই গুহায় সুতনুকা নামে দেবদাসী (নর্ত্তকী) বালাদিগকে (অন্যান্য নর্ত্তকীদিগকে লইয়া বাস করিতেন। রূপদক্ষ (চিত্রকর) দেবদিন্নও এই নাট্যশালায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্লক সাহেব রূপদক্ষ অর্থে 'চিত্রকর' করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় 'বেশকারী', তিনি চিত্রকর ত হইবেনই, সঙ্গে সঙ্গে রূপবিধানেও দক্ষ ছিলেন।

গুহা দুইটির ছাদে খোদিত চিত্রগুলিও মনোজ্ঞ। যথা—এক পুরুষ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট, বামে নর্ত্তকী ও বাদ্যকারগণ এবং দক্ষিণে হস্ত্যশ্বরথ সমন্বিত শোভাযাত্রা। বৃক্ষশাখায় পক্ষী এবং বৃক্ষতলে কতকগুলি মানবশিশু; সকলেই উলঙ্গ, তাহাদের কেশরাশি বামদিকে খোঁপার ন্যায় বাঁধা। পদ্মাসনে উপবিষ্ট উলঙ্গ পুরুষ, পার্শ্বে তিন জন বস্ত্র পরিহিত অনুচর। এক বাড়ীর গবাক্ষ সম্মুখে এক সুসজ্জিত হস্তী, নিকটে তিনজন বস্ত্র পরিহিত পুরুষ দণ্ডায়মান, পার্শ্বে অশ্বযোজিত ছত্রযুক্ত রথ বা শকট।

এই দুই গুহা, তাহাদের ব্যবহার এবং সেখানকার লোকজন ও চিত্রাদির পরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আজ ভারতবর্ষের প্রাচীন নাট্যশালার তথ্য যেটুকু জানা যাইতেছে, ইতিহাসে তাহার মূল্য বড় অল্প নহে।

রঙ্গমঞ্চ, শ্রাবণ, ১৩৪৭

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে, প্রথমে সংস্কৃত নাটক ও সেই সকল নাটকীয় যুগের নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় মুখবন্ধরূপে উল্লেখ করা উচিত মনে হয়। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে কেহ বাঙ্গালী ছিলেন কি না, তাঁহাদের সময়ে বাঙ্গালাদেশে নাট্যশালা ছিল কিনা, তাহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর মুসলমান রাজত্বে ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময়ে বাঙ্গালীর নাটকীয় রুচি কি ভাবে উদ্ভূত ও বিকশিত হয় এবং কি ভাবেই বা তাহার পরিণতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে, এই ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। কিন্তু ইহার অবতরণিকাতেই যদি এই সকল দুষ্প্রবেশ্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে ইহার উপক্রমণিকা লিখিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা ঐ সমস্ত বিষয় ইহার পরিশিষ্টভাগে সন্নিবেশিত করিব, ইচ্ছা রহিল।

নাট্যামোদ স্পৃহা বাঙ্গালীর হৃদয়-মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে যখন পাঠান রাজাদিগের রাজত্ব, যখন তাঁহারা দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া বাঙ্গলাদেশ শাসন করিতেছিলেন, সে আজ চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা—তখন হইতে বাঙ্গালীর মনে নাট্যামোদের বিকাশ দেখা যায়। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই তাহার সাক্ষী। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের আঙ্গিনায় সখীভাবে সঙ্কীর্ত্তন-কালে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিধানে ভাব সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্গলা দেশে যে যাত্রার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে এই নাট্য-চেষ্টার যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে যখন প্রবাসী ইংরাজেরা ইউরোপীয় প্রথায় নাট্যশালা বাঁধিয়া নাট্যামোদ উপভোগের ব্যবস্থা করেন, তখন বাঙ্গালীর মধ্যে যাত্রার আমোদ যথেষ্ট প্রচলিত

হইয়াছিল। বাঙালী এই যাত্রার আমোদের মধ্যে কতকাল পূর্ব্বে, কিরূপে ইউরোপীয় প্রথায় নাট্যামোদ উপভোগের শিক্ষা প্রথম লাভ করিয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল নাটক আছে, তাহাদের রচয়িতার মধ্যে বাঙ্গালী লেখকের অভাব নাই, কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে এদেশের কোথাও কোন নাট্যশালা ছিল কিনা তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; সুতরাং নাট্যশালা বাঁধিয়া নাট্যামোদ উপভোগ করিবার চেষ্টা যে ইংরাজ সংস্পর্শেই জন্মিয়াছে, তাহা আপাততঃ নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

১১৬৪ সালের আষাঢ় মাসে (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন) ইংরাজ পলাসীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া কলিকাতায় রাজধানীর সূত্রপাত করে এবং ১১৭২ সালের শ্রাবণ মাসে (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট) ক্লাইভ বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতাবাসী ইংরাজ গণের মধ্যে নাট্যামোদ স্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ-দিগের পক্ষেও এদেশীয়দিগের ন্যায় আলবোলার নল মুখে দিয়া তামাকু টানিতে টানিতে 'বাইনাচ' দেখা ভিন্ন আমোদস্পৃহা পরিতৃপ্তির অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময়েই ক্রমশঃ কলিকাতা কুঠির প্রধান প্রধান ইংরাজদিগের চেষ্টায় প্রথম প্রথম আবৃত্তিরূপে নাটকীয় অংশ পাঠের প্রথা নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার পর ক্রমশঃ কথোপকথনচ্ছলে (dialogue) অভিনয়ের ক্ষীণ আভাস দেখা দেয়। এরূপ ব্যবস্থা প্রধান প্রধান ইংরাজদিগের আলয়ে ভোজের নিমন্ত্রণেই হইত। ইহাতে ইংরাজ কুঠির উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরাও যোগ দিতেন। এই নাট্যমোদ-স্পৃহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন তাঁহাদের নাট্যশালা নির্ম্মিত হয়। সে পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বের ঘটনা। তাহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা প্রকাশ্যভাবে ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃঃ)

এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে কেবল বাঙ্গালার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে এদেশে কালেক্টার নিয়োগ, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন, বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, প্রথম সংবাদপত্র প্রচার, এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন, মাদ্রাসা স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহার পর যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃত ক্ষমতা লাভ করিয়া গবর্ণর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন, সে ১১৮০ সালের (১৭৭৩ খৃঃ) কথা। তখন কলিকাতাবাসী আমোদ-প্রিয় ইংরাজরা চাঁদা করিয়া আর একটি বৃহৎ নাট্যশালা স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

আদি ইংরাজী থিয়েটার

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে গভর্ণর ড্রেকের আমলেই কলিকাতায় ইংরাজ-দিগের আদি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য লালবাজারে তুইটি স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল। এই বাড়ী তুইটির নাম ছিল—"The Harmonicum" ও "The London Taverns" এই তুই প্রমোদাগারে মধ্যে মধ্যে নাচ, গান, কনসার্ট, বাজী ইত্যাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ ও সহরের অন্যান্য ইংরাজ একত্র হইয়া এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং আনন্দ উপভোগ করিতেন। হিকির বেঙ্গল 'গেজেট' (Hicky's Bengal Gazette or Calcutta general Advertiser) নামক প্রাচীন সংবাদপত্রে (এই সংবাদপত্র ১১৮৭ সালের পৌষ মাসে,—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী শনিবার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়) উক্ত তুই প্রমোদাগারের তুই একটি বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়।

* * * *

হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দেখা যায়,—

At Mr. Williamsons' (Vendu-master to the Hon. Company) Auction Room—Old play House ইহা হইতে বুঝা যায় যে আদি নাট্যশালায় তখন আর অভিনয় হয় না, উইলিয়ামসন সাহেব সেখানে নিলামের কারবার খুলিয়াছেন এবং উহা সাধারণে 'পুরাতন

নাট্যশালা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পুরাতন নাট্যশালা বলিবার আরও একটু কারণ তখন ঘটিয়াছিল,—তখন রাইটার্স বিল্ডিংএর পশ্চাদ্দিকে The Calcutta Theatre নামে আর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তখন (১৮৮৭) অভিনয় চলিতেছিল। এই কলিকাতা থিয়েটারকে তখন লোকে নূতন নাট্যশালা "The New Play House" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহার বিবরণ পরে যথাস্থানে লিখিত হইবে।]

যাহা হউক, উল্লিখিত প্রমোদাগার দুইটি বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই ইংরেজরা তাঁহাদের আদি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল "The Play House" ১১৬০ সালে (১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে) লেফটেনাণ্ট উইল্‌স্ ফোর্টউইলিয়ম ও তাহার নিকটবর্ত্তী সহরের কতকাংশের একখানি নক্সা প্রস্তুত করেন। * এই নক্সায় লালবাজারেব মোড়ের নিকট রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটি নাট্যশালার স্থান নির্দ্দেশিত আছে। সেই নাট্যশালাই যে আদি নাট্যশালা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১১৬৩ সালে (১৭৫৬ খৃঃ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখনকার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তিনি ইংরাজদিগের একটি নাট্যাগার অধিকার করিয়া সেখানে একটি কামান বসাইয়া দেন এবং সেই কামান হইতে ফোর্ট উইলিয়ম ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি অট্টালিকার উপর গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ করেন। এই গোলাবৃষ্টিতে কলিকাতার আদি গির্জ্জা 'সেণ্ট এ্যান্‌স্ চর্চ্চ' ধ্বংস হয়। †

তাহার পর পলাশী যুদ্ধের গোলমাল থামিয়া গেলে যখন দেশ শান্ত হইল, তখন ইংরাজদিগের গির্জ্জার অভাব দূর করিবার চেষ্টা হয়। হাইডের

---

* The place of Fort William and Part of the City of Calcutta —By Leiut. Wills'—1753.

† এ গির্জ্জা ফোর্ট উইলিয়মের নিকটে ইংরাজ প্রবাসিগণের উপাসনার জন্য ১১১৬ সালে (১৭০৯ খৃঃ) রাইটার্স বিল্ডিংএর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কোয়ার—উত্তরের রাস্তার সংযোগস্থলে, যেখানে রাইটার্স বিল্ডিংএর গুম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টকোণী অট্টালিকাটি অবস্থিত ঠিক সেইস্থানে ঐ গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

Parochial Annual of Bengal নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে এই সময়ে সহজে অল্পব্যয়ে সত্বর গির্জ্জার অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই নাট্যশালাকেই আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া গির্জ্জায় পরিণত করিবার সঙ্কল্প হয়। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম ডিরেক্টরগণকে বিলাতে লিখিয়া পাঠান হয় এবং তাঁহারাও ১১৬৪ সালের চৈত্র মাসে * (১৭৫৮ সালের ৩রা মার্চ্চ) তাহাই করিবার আদেশও দিয়াছিলেন, কিন্তু সে আদেশ মত কার্য্য করা হয় নাই।

এই নাট্যশালায় কেহ বেতনভোগী অভিনেতা ছিল না। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ সর্ব্বদাই এখানে আসিতেন। ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃ) এই নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিককে দুই পিপা 'মেদিরা' নামক উৎকৃষ্ট মদ্য উপহার পাঠাইয়া দেন। এই উপহারের কারণ, তিনি এই দূরদেশে স্বজাতীয় নাট্যশালার উন্নতির জন্ম যথেষ্ট যত্ন লইতেন এবং কষ্ট সহ্য করিয়া সাজ পোষাক পট পরিচ্ছদাদির আয়োজন করিয়া পাঠাইতেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে "The Genuine Uemories of Asiations" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্যাপ্তেন ফিলিপ ড্রোমার ষ্ট্যানহোপ নামে এক ব্যক্তিকে এই পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি ঐ পুস্তকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, এই নাট্যশালার সঙ্গে একটি নৃত্যশালা সংশ্লিষ্ট ছিল। সেখানে গ্রীষ্মের আতিশয্যে নৃত্যশীলা মহিলারা রুমাল লইয়া সর্ব্বদা ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে নাচিতে কতটা অসুবিধা অনুভব করিতেন এবং তাঁহাদের তুষার ধবল ললাটে পুনঃপুনঃ কেমন বড় বড় ঘর্ম্ম বিন্দুর উদয় হইত, তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। †

* কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরগণ লেখেন,—We are told the building formerly made use of as Theatre may with a little expense be converted into a Church of public of worship as it was built by the voluntary contributions of the inhabitants of Calcutta, we hape, there canbe no difficulty in getting it frealy applyed to the—before mentioned purpose, especially when we authorize you to fit it up decantly at the Companys' expense as we hereby do.—Wilson: Old Fort Willim. Vol II. P. 130

† আমাদের মনে হয় মিঃ ষ্ট্যানহোপ একটু ভুল বুঝিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত নৃত্যশালা এই নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত Harmonicum বা

কোর্ট অফ ডিরেক্টারগণ যে আদেশপত্রে এই নাট্যশালাকে গির্জ্জায় পরিণত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জানিতে পারা যাইতেছে যে এই থিয়েটার এখানকার ইংরাজ অধিবাসিরা চাঁদা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

লালবাজারের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এই নাট্যশালা কোথায় ছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহা নির্ণীত হয় নাই। কলিকাতায় নবগঠিত ঐতিহাসিক সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মিঃ ফার্মিঞ্জারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহার স্থান এবং গৃহাবশেষ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুলিশ কোর্টের সম্মুখে * ৮নং লালবাজার ষ্ট্রীটে এখন সুবৃহৎ চতুস্তল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু কয়েকমাস পূর্ব্বে এখানে একটি একতলা পাটের গুদাম ছিল। এই গুদামের পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুরাতন ফটক এবং গুদামের রাস্তার দিকে প্রাচীরাংশটি যে ভাবে গাঁথা ছিল, তাহাতে তাহা যে কোন পাটের গুদামের সম্মুখ ভাগের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যাইত না। এই অংশটি দেখিলেই মনে হইত, ইহা নিশ্চয়ই কোন প্রকার উচ্চ কার্য্যে ব্যবহৃত অট্টালিকার প্রাচীরাংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিম পার্শ্বের ফটকটির পশ্চাদ্দেশ বন্ধ করিয়া গৃহাকারে ভাড়া দেওয়া হইত। প্রাচীন কাষ্টম হাউসের চতুর্দ্দিকে যে চারিটি স্তম্ভ এবং গোল বৃহৎ খিলান বিশিষ্ট ফটক ছিল এই গুদামের পশ্চাদ্দিকের ফটকটিও ঠিক সেইরূপ ছিল। ফার্মিঞ্জার সাহেব এই স্থান পরিদর্শন করিয়া জানিতে পারেন যে, সম্মুখের ঐ প্রাচীরাংশ ব্যতীত গুদামের আর সমস্ত অংশই ৫০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। তিনি ফটকটি সম্বন্ধে কোন বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। যাহা হউক তাঁহার অনুসন্ধানে এই প্রাচীরটিই সেই আদি নাট্যশালার সম্মুখের প্রাচীর বলিয়া নির্ণীত হয়। উইল্‌সের নক্সায় যে স্থলে আদি নাট্যশালার স্থান নির্দ্দেশিত

London Tavers নামক প্রমোদাগার দ্বয়ের অন্যতর হইবে। তিনি যখন আসিয়াছিলেন তখন হয়ত উভয় স্থানের অধ্যক্ষতা একই ব্যক্তিবর্গের হাতে ছিল আর সেই জন্যই ভুল হইয়া থাকিবে।

* প্রবন্ধ প্রকাশ কালে ১৯০৯ অব্দে পুলিশ কোর্ট ছিল। এখন পুলিশ আফিস হইয়াছে।—নাট্য-ভারতী সম্পাদক।

আছে, তাহার সহিত এই অনুমানের বিরোধ না হওয়ায় উহাকেই আদি নাট্যশালার গৃহাবশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই আপত্তি করেন নাই। ফটকটিও যে আদি নাট্যশালার ফটক, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এখন যে চতুস্তল সৌধ সেই প্রাচীন স্মৃতি-নিদর্শন দুইটিকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বের উক্ত ঐতিহাসিক সমিতি যদি স্মৃতি-রক্ষার্থ একখানি খোদিত প্রস্তর-ফলক লাগাইতে পারেন তাহা হইলে সমিতি সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। *

এই আদি নাট্যশালায় কবে অভিনয় বন্ধ হয়, কেনই বা ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরে ইংরাজদিগের আর এক নূতন নাট্যশালা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা নির্ম্মাণের ঠিক সময়টিও জানা যায় নাই; কিন্তু ১১৬০ সালে (১৭৫৩ খৃঃ) তাহা যে বর্ত্তমান ছিল, প্রসিদ্ধ উইল্‌সের নক্সা হইতে তাহা জানা যাইতেছে এবং ১১৮৭ সালেও (১৭৮০ খৃঃ) যে তাহা 'নিলাম ঘর (Auction Room) রূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাও হিকির গেজেট হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর কবে তাহার প্রকৃত ধ্বংস হয়, এবং গুদাম নির্ম্মাণের সময় তাহার সম্মুখের প্রাচীরটা কেমন করিয়া রাজমিস্ত্রীর শাবলের আঘাত হইতে অতর্কিতভাবে বাঁচিয়া গেল, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। † (ক্রমশঃ)

ব্যোমকেশ মুস্তফী

* ঐতিহাসিক সমিতি এই প্রাচীন অট্টালিকার যে ছবি Bengal :—Past and Present নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তাহাই এখন এই স্মৃতির একমাত্র অবশেষ বলিতে হইবে। কার্ম্মিস্থার সাহেবের ফটকটির প্রতি লক্ষ্য না থাকায় ঐ ছবিতে ফটকটির ছবি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

† ব্যোমকেশ মুস্তেফী লিখিত 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৭) প্রকাশিত। ৩৩ বৎসর পূর্বে কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে লেখক এই ইতিহাসের মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া প্রাথমিক কাঠামোখানি গড়িয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

সীতারাম

(বৃহত্তর সমাজের ইতিবৃত্তমূলক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

বাঙলার নূতন রাজধানী মুরশিদাবাদের এক জঙ্গলাকীর্ণ পতিত-অঞ্চল সদ্যোরচিত বৃহৎ দীর্ঘিকাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। বাদশাহ ফরক্সের সুবে বাঙলার সুদক্ষ নাজিম-দেওয়ান মুরশিদ কুলিখাঁকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নাজিম বা শাসনকর্তার (সুবেদারী) ফরমান সহ 'নবাব' খেতাব প্রদান করায়—বৎসরের প্রথম দিনে নওরোজ পর্বটিকে উপলক্ষ করিয়া—নূতন নবাবের নির্দেশেই এই সার্বজনীন উৎসবটির আয়োজন হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি ব্যাপিয়া উৎসব চলিলেও দীর্ঘিকাতীরবর্ত্তী খানিকটা স্থান স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নরনারীদের জন্য নির্দিষ্ট। শুভ্র আস্তরণ-মণ্ডিত সুশ্রী বেত্রাসনগুলি সাজাইবার কৌশলে স্থানটি দরবার বা মর্য্যাদাসূচক আসরে পরিণত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে নবাব বাহাদুরের জন্য সংরক্ষিত মখমল-মণ্ডিত হস্তিদন্তনির্ম্মিত আসনখানি শোভা পাইতেছে; উভয় পার্শ্বে কিছু নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাজানো আসনগুলির অধিকাংশই পূর্ণ। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পুরোভাগে চাঁচড়াধিপতি মনোহর রায়, মীরজানগরের ফৌজদার নূরউল্লা, ভূষণার উজীর পীর আলি খাঁ, নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায়, ভাওয়ালের ভূস্বামী দৌলত গাজি, সন্তোষের ভূস্বামী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, গৌরীপুরের রাজা গৌরীপ্রসাদ প্রভৃতি পাশাপাশি উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে সবুজ রঙের চিক্ দ্বারা পরিবৃত মহিলাদের স্থানটুকু চিহ্নিত করা আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন, অধিকাংশই বোর্খা পরিহিতা। কতিপয় হিন্দুমহিলা অবগুণ্ঠনবতী। কেবল একটি দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী ও বলিষ্ঠদেহ তরুণীকে চিকের বাহিরে দেখা যাইতেছে। এই মেয়েটির মাথায় অবগুণ্ঠন নাই; দিব্য সহজ ভঙ্গিতে এবং অসঙ্কোচে সে দীঘির জলে উপল নিক্ষেপ করিতেছে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলির অনেকেরই অপলক দৃষ্টি এই লজ্জাসঙ্কোচহীনা মেয়েটির ছেলেখেলায় নিবদ্ধ।

সামনের দিকে শ্রেণীবদ্ধ ফুলগাছগুলির মধ্যে যে সমতল স্থানটি সবুজবর্ণের গালিচায় আবৃত, তথায় উৎসবের গান চলিয়াছে। বিখ্যাত তয়ফাওয়ালী আয়না বিবি নওরোজের কোন বিখ্যাত গানে বর্ণিত মূর্ত্তিগুলির আকৃতি ও কর্মধারা বিচিত্র নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ পূর্বক গানটিকে যেন সার্থক এবং বাস্তবে রূপায়িত করিতেছে।

আয়না বিবির পরিচ্ছদ ও সজ্জায় সুরুচি এবং শালীনতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। সাদা রঙের ঘাগরার উপর আসমানি রঙের সাদাসিধা জামাটি এমন আঁটসাঁট করিয়া পরিয়াছে যে তাহার দেহ-সৌষ্ঠব তাহাতে দিব্য কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জামার উপরে পাতলা ওড়নাটি নাচের তালে তালে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। মাথার দীর্ঘ চুলগুলি বেণীবদ্ধ হইয়া পীঠে দুলিতেছে। সামনের দিকে চুলে একটি বৃহৎ গোলাপফুল গোঁজা রহিয়াছে। চোখের কোলে কাজলের রেখা, মুখে হাসিটুকু সর্বক্ষণই লাগিয়া আছে। কাণে মুক্তার দুল, কণ্ঠে ও প্রকোষ্ঠে অনুরূপ স্বল্প অলঙ্কার, কিন্তু পরিবার কৌশলে তাহাতেই অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দীর্ঘ নৃত্যটি শেষ হইতেই বিভিন্ন স্বরে সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ গায়িকা-নর্ত্তকীর উদ্দেশে প্রশংসাবাদ করিলেন :

বিভিন্নকণ্ঠে : খাসা ; সাবাস বাঈজী ; চমৎকার ; বহুতাচ্ছা !!

আয়নাবিবি সহাস্য-বিনয়-ভঙ্গিতে প্রশংসাকারীদের উদ্দেশে সময়োচিত অভিবাদন নিবেদন করিল। জমকালো পরিচ্ছদধারী দুইজন পদস্থ পুরুষ এতক্ষণ একটা কুঞ্জের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহারা সহসা সদর্পপদসঞ্চারে আয়নাবিবির সান্নিধ্যে আসিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। সমবেত সম্ভ্রান্তগণ এই দুই ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখভঙ্গিতেই তাহা সুস্পষ্ট হইল। যেন, উচ্চপদস্থ হইলেও ইহাঁরা দুইজনে ইহাঁদের অবাঞ্ছিত। এমন কি, তয়ফাওয়ালি আয়নাবিবির মুখের নিরবচ্ছিন্ন হাসিটুকুও যেন এই দুই ব্যক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওষ্ঠে মিলাইয়া গেল—সম্মানভাজন ব্যক্তিদ্বয়কে অভিবাদন করিতেও তাহার হাতখানি উঠিল না। কিন্তু এগুলি আগন্তুকদ্বয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাঁহারা এক নজরেই ব্যাপারটা আগাগোড়া উপলব্ধি করিয়া মনে মনে যেমন জ্বলিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই উভয়ের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। আগন্তুকদ্বয়ের একজন হইতেছেন—সৈয়দ রেজা খাঁ, অন্যজন—নাজির আহম্মদ। উভয়েই সমগ্র সুবার রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। উভয়ের বয়স গড়াইয়া পড়িয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু সখ যে এখনও কমে নাই, বাহারী সাজ-সজ্জাতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। উভয়েই মনের সমস্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ আয়নাবিবির উপর প্রয়োগ করিয়া বলিলেন :

রেজাখাঁ : খাসা ত নয়ই, সাবাস ব'লে বাহোবা দেবারও কিছু নেই—

নাজির : বরং—যাচ্ছে তাই—

রেজাখাঁ : তার ওপর সঙ !

আয়না বিবি : সঙ কে জনাবালি ?

রেজাখাঁ : চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে নাকি ?

নাজির : আসরটাই মাটি করে দিলে বিবি ! নাচটা নেহাত বাজে আর, নাচের পয়না দেখে ত হেসে বাঁচিনে ! তিনশ' আসরফি মজরোব বাঈজীর সাজের এই হাল ? আরে—ছো, ছো, ছো—

রেজাখাঁ : সঙ সেজে এসেছে—সঙ।

আয়না বিবি : ও, তাই বলুন ! আসল কথা এতক্ষণে বুঝিছি।

নাজির : কি ?

আয়না। বুঝিছি এই—রসুন বলে কাঁচকলা ভাই তোমার বড় খোসা !

রেজা : এ-কথার মানে ?

আয়না : আয়না বিবি সামনে দাঁড়িয়ে, তবু মানে বুঝতে পারলেন না সাহেব ?

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া রেজা ও নাজির উভয়ে মুখ-চাওয়া-চাউই করিলেন।

আয়না : আপনাদের গায়ের কোর্ত্তা ছুটি ত তোফা ! কাঁচা-পাকা দাড়ির সঙ্গে কিবে মানিয়েছে ! সঙ কি গাছে ফলে সাহেব ?

রেজা : কি বললি কসবি ?

আয়না : মুখ সামলাও সাহেব, তয়ফাওয়ালি হলেই কসবি হয় না।

রেজা : না, তুমি বাদসার হারেম থেকে এসেছ তয়ফা গাইতে !

আয়না : বাদসার হারেমের খবর রাখিনে, কিন্তু আমার হারেমে আমি কারো চেয়ে ছোট নই। নয়া নবাবের নাম করে আপনারাই আমাকে এখানে আনিয়েছেন, সেধে আসিনি আমি। ডেকে এনে এভাবে আমাকে অপমান করবারকোন এক্তিয়ারই আপনার নেই।

নাজির : আহাহা—ভারি সম্মানি মানুষ তুমি, সৈয়দ রেজা খাঁ সাহেবের ছোট একটা কথার ঘা সইতে পারছ না, অপমান হয়েছে ভেবে ফোঁস করে উঠ্‌ছ!

রেজা : তুমি যাকে অপমান বলে ভাবছ, আমরা স্থির করেছি সেটা অপরাধ। এখন এর শাস্তি তোমাকে নিতে হবে।

আয়না : তাই নাকি! কিন্তু তয়ফাওয়ালি আয়নাবিবি ত সুবে বাঙলার কোন বাকিদার ভূঁইয়া নয় যে আপনাদের 'বৈকুণ্ঠের' পানিতে চোবাবেন, অথবা ঢিলে ইজেরের ভিতরে ইমলিবিছে ছেড়ে দিয়ে টাকা আদায় করবেন! শাস্তিটা বোধ হয় মুলতুবিই রাখতে হবে।

রেজা : এই মজলিসে সবার সামনে আমি তোমাকে সহবৎ শেখাতে চাই—

আয়না : ভুল হচ্ছে জনাবালি, আপনারই উচিত নিজের অন্দরমহল থেকে ওটা আগে ভাল করে শিখে আসা।

রেজা : তবে রে, কসবি...

কথার সঙ্গে সঙ্গে রেজা খাঁ আয়না বিবির পৃষ্ঠে আলম্বিত দীর্ঘ বেণীটি ধরিবার জন্য কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই নাজির তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বাধা দিয়া চাপা কণ্ঠে বলিলেন :

নাজির : করছ কি দোস্ত, থামো।

রেজা : থামবো কি, আমি এই বে-অকল্ কসবিকে সবার সামনে পয়জার দিয়ে সায়েস্তা করে তবে ছাড়বো।

আয়না : তামাম মুলুকের বাদশার দোহাই, সুবে বাঙলার নয়া নবাবের দোহাই, এই মজলিসে যে-সব ইমানদার আমীর ওমরাহ রইস রাজা তালুকদার সওদাগর সাহেবরা দরাজগলায় এতক্ষণ আয়নাবিবিকে বাহোবা দিচ্ছিলেন—তাঁরা করুন এর বিচার, তাঁরা রাখুন এই তয়ফাওয়ালির ইজ্জৎ।

আয়না বিবির মর্মস্পর্শী আবেদন সভায় উপবিষ্ট সভ্যগণের মর্মদ্বারে আঘাত দিল বটে, কিন্তু তাহার ফল হইল অন্যরূপ। পুরোভাগে উপবিষ্ট বিশিষ্ট সম্মানী সভ্যগণ এতক্ষণ পরস্পর গা-টেপা-টেপি করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বুদ্ধিমানের মত এক সঙ্গে উঠিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা বসিয়া রহিলেন, অতিমাত্রায় কৌতূহলী হলেও সৈয়দ রেজা-খাঁর বিরুদ্ধে মুখ তুলিয়া কথা কহিবার মত দুঃসাহস যে কাহারো নাই, মুখভঙ্গিতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। রেজা খাঁর মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রেজা : কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে সৈয়দ রেজা খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তকরার করবার স্পর্দ্ধা রাখে।

ভাওয়ালের ভূস্বামী দৌলত গাজি এবং সন্তোষের জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উপবিষ্টদের মধ্যে ছিলেন। এই সময় তাঁহারা ক্ষিপ্রপদে নিকটে আসিয়া রেজাখাঁর উদ্দেশে বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন :

দৌলতগাজি : জনাব, বেচারী তয়ফাওয়ালির কসুর মাফ করতে হুকুম হোক।

ইন্দ্রনারায়ণ : আমিও অনুরোধ করছি খাঁসাহেব! জনাব হচ্ছেন গরীবপরোয়ার, বেচারীকে এবারকার মত মাফ করে...

দুই প্রবীণ ভূস্বামীর আর্জ্জি শুনিয়া তয়ফাওয়ালির নেত্রমণি জ্বলিয়া উঠিল যেন; তর্জ্জনের স্বরে ঝঙ্কার তুলিল :

আয়না : আমার জন্যে কে আপনাদের সেধেছে—ঐ ইতরটার কাছে মাফ চাইতে। আমি চেয়েছি বিচার, সেধেছি ইজ্জত রক্ষা করতে। তার সাধ্য থাকে ত মুখ খুলুন, নৈলে বোর্খা পরে মুখ ঢেকে মেয়ে সেজে চুপ করে বসে থাকুন।

দৌলত : ইয়া আল্লা!

ইন্দ্রনারায়ণ : নসীবের মার, খোদার কি দোষ!

রেজা : ডাকো বিবি—ডাক, তোমার খসমদের ডাকো...

দৌলতগাজি এবং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মুখ চুণ করিয়া যথাস্থানে গিয়া বসিলেন। আর কাহাকেও উঠিতে দেখা গেল না। কিন্তু অদূরে মহিলাদের বসিবার স্থানে চিকের

পাশটিতে দাঁড়াইয়া যে মেয়েটি এতক্ষণ দীঘির জলে উপল ফেলিতেছিল, আয়নাবিবির কথাগুলি বুঝি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। এই সময় সে তাহার খেলা ছাড়িয়া চঞ্চলপদে কতিপয় কুঞ্জ অতিক্রম করিয়া অকুস্থলটির দিকে অগ্রসর হইল। আয়নাবিবি তখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, আত্মসমর্পণেরভঙ্গিতে অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিতেছিল:

আয়না: আর ডাকাবো না; আমার মুখ তুমি বন্ধ করে দিয়েছ—এখন নিশ্বাসটিও বন্ধ করে দাও।

নাজির: গোস্তাকির একটা সীমা আছে বিবি—বুঝলে?

রেজা। বহুৎ রইস ব্যক্তির বাহোবা শুনে বিবির মাথা গরম হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল বিবির চীৎকার শুনে সবাই হৈ হৈ করে ছুটে আসবে, এখন হালে পানি না পেয়ে নিচু হচ্ছেন।

আয়না: মারো আমাকে পয়জার, আমি তাই চাই—

বলিয়াই আয়নাবিবি দুই হাতে মুখখানি চাপিয়া মাথাটি নত করিল। ঠিক এই সময় পূর্ব্বোক্ত মেয়েটি (শান্তা) তাহার পার্শ্বে আসিয়া চিবুকটি তুলিয়া কহিল,

শান্তা: এমনি করে পরাজয় যদি মেনে নাও বোন, বিচার যে তাহলে লজ্জায় দেশ ছেড়ে পালাবে!

আয়না: কে! কে তুমি কথা বললে? কই—তোমার ঘাড়ে ত দুটো মাথা দেখছি না? তুমি ত দেখছি আমারই মত এক মেয়ে।

শান্তা: হ্যাঁ। কোন মিঞা নই—মেয়ে।

আয়না: পালাও, পালাও। ঐ দেখ—সবাই অবাক হয়ে তোমাকে দেখছে। তোমার লজ্জা করছে না?

শান্তা: না। মানুষের লজ্জা মানুষের কাছে। এখানে মানুষ কেউ আছে, যে লজ্জা করব?

এত বড় কথা অপরিচিতা এই মেয়েটির মুখে শুনিয়া সমবেত সকলেই বুঝি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আয়নাবিবির মুখেও আর কথা যোগাইল না, এই নির্ভীক ও স্পষ্টবাদিনী তেজস্বিনী মেয়েটির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অনবদ্য মুখখানির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

রেজা খাঁ এবং আহম্মদ আলির মধ্যেও একটা নীরব ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। রেজা খাঁ দুই পা অগ্রসর হইয়া কৃত্রিম শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন :

রেজা খাঁ : সালাম—বিবিসাহেব, সালাম। এই আয়নাবিবির কথা, না হয় ছেড়েই দিলুম—ও, হচ্ছে তয়ফাওয়ালী, সরমের ধার ধারে না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন রইস ঘরোয়ানার জানানা। এসেই সাফ্ কবুল করলেন—মানুষ নেই বলেই সরম লজ্জা ছেঁটে ফেলেছেন! ভারি তাজ্জব ত!

শান্ত : তাজ্জব কেন, ওয়াজিব কথা। যা যথার্থ, তাই বলেছি।

নাজির : আপনি এঁকে চেনেন না নিশ্চয়ই! ইনি হচ্ছেন সুবে বাঙলার কানুনগো সৈয়দ রেজা খাঁ—বাঙলার ভুঁইয়াদের ভারি মেহেরবান্ দোস্ত্।

শান্তা : জানি। নূতন বৈকুণ্ঠের সৃষ্টিকর্ত্তা। দায়গ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত প্রজাপতিদের দেহের চামড়া পর্য্যন্ত ছিঁড়ে খাবার জন্যে নূতনতম পীড়নকৌশলের প্রবর্ত্তক!

নাজির : নওরোজের এই নয়া তলাওর চেয়েও রেজাখাঁর বৈকুণ্ঠের তলাও ঢের বেশী জলুষদার বিবিসাহেব - বুঝলেন! সহরের ময়লা দিয়ে তার যে পানি বানানো হয় ক্রোশভোর তফাৎ থেকে খোসবু ছোটে। বাকিদার ভুঁইয়াগুলোকে ধরে এনে যখন সেই বৈকুণ্ঠে ফেলা হয়—ময়লার পোকাগুলো হন্নে হয়ে তেড়ে এসে চাম কামড়ে ধরে—ওরা চীৎকার করে কাঁদতে থাকে, —আর—সৈয়দ রেজাখাঁ সাহেব তখন কিনারায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় সোহরৎ করেন—বাজাও দামামা, বাজাও ঢাক, ঢোল, কাঁসী, বাঁশী, ঘণ্টা ;—বৈকুণ্ঠে চলেছে মোচ্ছব।—এমন জবরদস্ত মিঞাকেও আপনি মানুষ বলে মানবেন না বিবিসাহেব ?

শান্তা : তাহলে বোরখা না পরে সামনে এসে দাঁড়াই—আঁচলখানা তুলেও মুখ ঢাকি না ?

রেজাখাঁ : বুঝিছি, বিবিসাহেব আমাকে নিশ্চয়ই 'সের' সাব্যস্ত করেছেন—নয় ?

শান্তা : তাহলে সেরকে অনেক ছোট করা হয়।

রেজাখাঁ : তবে ?

নাজির : সৈয়দ রেজাখাঁকে আপনি কি ঠাওরেছেন বিবি ?

শান্তা : ভাগাড়ের শকুন ছাড়া আর কি বলি ?

রেজাখাঁ : শোভানাল্লা

আহম্মদ : আর—আমি ?

শান্তা : চীল। কুটা গাছটিও বাদ দেন না।

নাজির : বটে ! আর—ঐ সব সম্মানী ব্যক্তিরা—রাজা, তালুকদার, ভুঁইয়া, সওদাগর, মোকামওয়ালা রইস সব ? ওঁদের কি বলতে চান ?

শান্তা : বেশীর ভাগই কোলা-ব্যাঙ, খোঁচা দিলেও নড়না, কতক-গুলো হচ্ছে—খরগোস, সারা দেহখানা সদরে রেখে মুখটা আঁধারে ঢেকে মান বাঁচাতে চায়। আর আছে—শিয়াল, কুকুর, ছাগল। মানুষ কোথায় যে লজ্জায় ঘোমটা দেব ?

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এবার যেন চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রত্যেকেই সোজা হইয়া বসিলেন, উত্তেজনার আতিশয্যে কেহ কেহ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, যাঁহারা মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন এখন চোখ পাকাইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, এমন কি যে কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী বিরক্তিকর পরিস্থিতির সময় স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন—এবং দূরে গিয়া লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকেও অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল। এই দলে ছিলেন চাঁচড়ার ভূস্বামী রাজা মনোহর রায়, নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম, মীর্জ্জানগরের ফৌজদার নুরউল্লা এবং ভুষণার ফৌজদার-

প্রতিনিধি পীর আলি খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ইহাঁদের পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই সমবেতগণের মধ্যে উত্তেজিত কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল ঃ

১ম : শুনছেন আস্পর্দ্ধার কথা—শুনছেন ?

২য় : শুনছি বইকি ! আমরা মানুষ নই—

৩য় : আমরা ব্যাঙ—

৪র্থ : আমরা খরগোস—

৫ম : আমরা শ্যাল কুকুর ছাগল—

২য় : থামুন-থামুন—চাঁচড়া, নাটোর, মীর্জ্জানগর আর ভূষণার মাতব্বররা ফিরে আসছেন রুখে—

১ম : তখন হাঙ্গামার ভয়ে উঠে গেলেও উপে যাননি তাহলে, কানাচেই ছিলেন !

মনোহর, দয়ারাম, নূরউল্লা ও পীরখাঁ এই সময় উত্তেজিতভাবে শান্তার সান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মনোহর : খাঁ সাহেব দেখছি মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে আছেন—

রেজাখাঁ : চুপ করে খালি খালি দাঁড়িয়ে আছি ভাববেন না রায় সাহেব—

নাজির : খাঁসাহেব ঠিক করতে পারছেন না এর পর কি করবেন ! আপনাদের মত বহুত ভুঁইয়াকে বৈকুণ্ঠে ফেলা হয়েছে, কিন্তু কোন জানানাকে এ-পর্য্যন্ত ওর ত্রিসীনায়ও নিয়ে যাওয়া হয়নি কিনা, তাই—

শান্তা : বেশত, নওরোজের দিনে ঐ পথটাই খুলে দিন না—একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।

রেজাখাঁ : বিশ বরষ হতে চলল বাঙলা মুলুকে এসেছি, কিন্তু এমন জাঁহাবাজ বাঙালী মেয়ে কখন দেখিনি। ভয় ডর নেই, লাজ

শরম মানে না। আপনি দেখেছেন—এরকম মেয়ে রায়সাহেব? আপনাদেরই ঘরের ত?

মনোহর: আমাদের ঘরের কোন মেয়ে এখনো রাস্তায় এভাবে নামেনি খাঁসাহেব,—তারা লজ্জাও ছাড়েনি, ঘোমটাও ফেলেনি।

নূরউল্লা: বেসক্! আমিভি জানি,—বড় ঘরোয়ানার হিঁদু জানানাদের আব্রু এত বেশী যে, কোন পাল পার্ব্বনে গঙ্গায় গোসল করবার দরবার হলে পাল্কীবন্দী করে দরিয়ার পানিতে পাল্কীশুদ্ধ চুবিয়ে আনা হয়।

দয়ারাম: এই দস্তর। চন্দ্র সূর্য্যেও আমাদের বাড়ীর মেয়েদের মুখ দেখতে পায় না। আমি এই মেয়েটির হাল চাল দেখে এই স্থির করেছি—নিশ্চয়ই এঁর মাথার গোলমাল আছে! নয় কি মা-লক্ষী?

শান্তি: আজ্ঞে না। ঘোমটার গুরু-ভার থেকে যে-মাথা মুক্ত, সেটা যে কত সুস্থ, তা কল্পনা করবার শক্তি আপনাদের নেই।

পীরআলি: যে-হেতু আমরা মানুষ নই! এই বান্দাকে কোন্ জানোয়ারের সামিল করেছেন বিবি সাহেব?

শান্তি: দুমুখো সাপ।

পীরআলি: বাপরে বাপ্! গরীব বেচারাকে এক দম সাপ বানিয়ে দিলে বিবি!

নূরউল্লা: কিন্তু বিবি মনে রেখো, ইনিও বড় কেওকেটা নন—ভূষণার ফৌজদার মীর আবুতোরাপ সাহেবের উজীর।

আয়নাবিবি: তাহলে এখন তয়ফাওয়ালীর ওপর হুজুরদের কি হুকুম? কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব আর? আমার নাচের পালা ত শেষ হয়েছে।

রেজাখাঁ: কিন্তু সাজার পালা ত এখনো সুরু হয় নি। তোমার গোস্তাকির শাস্তি নিতে হবে।

আয়নাবিবি : কোরাণ শরিফে আছে 'মুতু কবলান্ তুমুত!' মরবার আগে মৃত্যুকে বরণ কর। এই মেয়েটি সে কথাটি মনে করিয়ে দিলেন। শাস্তির আর ভয় রাখিনে সাহেব!

নাজির : বটে!

শান্তা : (খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

রেজাখাঁ : হাসি নয়, তামাসা নয়। আমি সৈয়দ রেজাখাঁ—

দয়ারাম : আমি এখনো বলছি খাঁ সাহেব, এঁর মাথায় ছিট আছে। আপনি উষ্ণ হবেন না। বরং এক কাজ করুন, এঁকে আমার হাতে দিন, আমার জানানামহলে পাঠিয়ে সুধরে দেব। তোমার বাবা থাকলে আমি হয়ত তাঁরই বয়সী হব মা-লক্ষ্মী! তুমি আমাকে মানুষ বলে না মানলেও আমি তোমাকে আমার মেয়ে মনে করেই জিজ্ঞাসা করছি মা, পরিচয় দিতে কি আপত্তি আছে?

শান্তা : আপত্তি কেন থাকবে? আমার পরিচয় ত কেউ জিজ্ঞাসা করেন নি।

রেজাখাঁ : আল্লা বিসমোল্লা! ভারি গলদ হয়েছে ত!

আহম্মদ : আমি ভেবেছিলুম আদালতেই ওটা জানাজানি হবে।

আয়না : আদালত ত আপনারা এইখানেই বসিয়েছেন!

নাজির : আলবৎ! যেখানে সৈয়দ রেজাখাঁ আসে—সেই খানেই আদালত বসে।

শান্তা : কিন্তু এই তয়ফাওয়ালী নিশ্চয়ই সরকারের বাকিদার প্রজা নয়, বরং পাওনাদারই হবে। আর, আমি ত সহরে নতুন এসেছি। এখন আরজদার এখানে কে?

নুরউল্লা : আবার ঝামেলা বাধলো দেখছি।

মনোহর : চমৎকার!

দয়ারাম : আমি অনুরোধ করছি মা-লক্ষ্মী, আর কথা বাড়িয়ে কাজ

নেই। আমার মুখে চেয়ে আগে তোমার পরিচয়টিই দাও, সব খোলসা হয়ে যাক।

শান্তা : কি পরিচয় চান তাই বলুন ?

দয়ারাম : তোমার নামটিই আগে বল—মা।

শান্তা : কুমারী শ্রীমতী শান্তা দাসী। পদবী হচ্ছে দাস ঘোষ।

মনোহর : কায়স্থ কন্যা!

শান্তা : যে-সে কায়স্থ নই—বল্লালী আমলের মস্ত কুলীন কায়স্থের কন্যা! দেখছেন না—এত বয়স হয়েছে, কিন্তু সিঁথিতে এখনো সিদুঁর ওঠেনি।

দয়ারাম : তোমার বাবা তাহলে—

শান্তা : বেঁচে আছেন এবং খুব নামও করেছেন। তার সাক্ষী দেখুন না—আপনারা এখানে ঝামেলা বাঁধাচ্ছেন, আর আমার বাবা নয়া নবাবের সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছেন।

রেজাখাঁ : তাই নাকি ?

মনোহর : ভাগ্যধরটি কে—শুনতে পাই না ?

শান্তা : বোধ হয় চেনেন তাঁকে। নাম হচ্ছে—বাবু মুনিরাম রায়।

নামটি শুনিয়াই প্রায় প্রত্যেকেই চমকিয়া উঠিলেন। কাহারও কাহারও মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিল ; মুখদিয়া অস্ফুট স্বরও বাহির হইল।

মনোহর : য়্যাঁ!

রেজাখাঁ : উকীল মুনিরাম-!

নাজির : নিজামত এবং দেওয়ানীর সেরা উকীল !

আয়নাবিবি : আর, আমরা জানি—তিনি মহারাজা সীতারাম রায়ের উকীল। তাঁর দৌলতখানায় হাজীর হ'য়ে অনেক গান গেয়েছি। আপনি উকীল সাহেবের মেয়ে—সালাম !

দয়ারাম : তুমি মুনিরামের কন্যা। তিনি যে আমার মস্ত সহায়। কিন্তু তাঁর কোন অনূঢ়া কন্যার কথাত শুনিনি!

মনোহর : মুনিরাম বাবুর সঙ্গে যদিও আমার তেমন মাখামাখি নেই, কিন্তু তাঁর বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আমার আলাপ অনেক-দিনের। আমাদের চাঁচড়ায় তিনি বহুবার গিয়েছেন। কিন্তু—তিনি ত কোনদিন বলেন নি যে, তাঁর এক বয়স্থা ভগিনী আজও অবিবাহিতা আছে!

শান্তা : বলবার সুযোগ হয় ত পাননি। কেননা, আমি এখানে নতুন এসেছি।

দয়ারাম : এতদিন কি তাহলে মনিরামবাবুর জমিদারী ধুলজুড়ীতেই থাকতে—মা?

শান্তা : না। বাঙলা মুলুক আর বাঙলা সমাজের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই ছিল না।

মনোহর : বটে!

রেজাখাঁ : য়্যাঁ!

দয়ারাম : সে কি মা! তাহলে—

শান্তা : ভিন্ জেলার এক গ্রামে মামার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। শৈশবেই মা যান স্বর্গে। মানুষ করেন মাতামহ।

দয়ারাম। তারপর?

শান্তা : মামুলী ঘটনা। কলমীদামের মত জল আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে—তা সে যত কালের পুরোনো বা পাঁক পড়া হোকনা কেন। তারপর পচে মর বা তলিয়ে যাও—তাতে কি! কুলটি বজায় থাকলেই হল।

মনোহর : এই দস্তুর, আর—কুলপতিদের ব্যবস্থাও তাই।

শান্তা : কাজেই পাঁকে তলিয়ে যাবার ভয়ে পালিয়ে যাই দেশ ছেড়ে।

সাথী হন দাদু। তাঁর দৌলতেই যা কিছু দেখা শোনা, আর জেনেছিও অনেক। সারা হিন্দুস্থানে হেন দেশ নেই—দাদু যা দেখান নি ?

দয়ারাম : বটে! খুবই অদ্ভুত ত! তা, দাদু এখন কোথায়!

শান্তা : আর কোথায়—যেখানে গেলে কেউ ফেরে না! আমার বয়েস হলেও সেখানে যাবার মত বয়েস হয়নি বোধ হয়, তাই ফিরতে হল আবার বাঙলা মায়ের কোলে।

দয়ারাম : কতদিন ফিরেছ ?

শান্তা : আজকের রাতটি ভালয় ভালয় কাটলে ত্রিরাত্রি পূর্ণ হবে।

দয়ারাম : বাবার মত নিয়েই কি এভাবে এখানে এসেছ মা ?

শান্তা : সেই কথাই বলছি—শুনুন না। পরশুদিন সকালে কাসিম-বাজারের চটি থেকে বাবার কাছে খবর পাঠাই—আমি বেঁচে আছি আর ফিরে এসেছি। আশ্রয় যদি দিতে চান—নিয়ে যাবেন এখান থেকে।

দয়ারাম : তারপর বাবা বুঝি গিয়ে নিয়ে এলেন ?

শান্তা : বাবা নিজে যান নি, সরকারী কাজে ভারি ব্যস্ত ছিলেন বলে দাদাকেই নিতে পাঠান। তার পর শুনুন মজার কথা—দাদা ত অজানা অচেনা বোনটির হাল চাল দেখে একবারে যেন হাড় গোড় ভাঙা দ আর কি! মুখখানা প্যাঁচার মত করে চেয়ে রইলেন। কাজেই মুখটিপে হেসে না বলে পারলাম না—পায়ের শেকোল ছেলে বেলাতেই কেটে ফেলিছি দাদা, এখন মনের শেকোল নিয়ে টানা-টানি চলেছে। দাদা আর কি করবেন, এনে বাবার এজলাসে হাজীর করলেন। বাবাকেও স্পষ্ট বললাম—হাঁড়িকাঠে মাথা গলাবার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আজ দেশে ফিরিছি ব'লে যদি পাহারা দিয়ে রাখতে চান, আমি তা মেনে নিতে পারব না।

দয়ারাম : বাবা শুনে কি বললেন ?

শান্তা : আমার কথাই মেনে নিয়ে বললেন—আমি লোক চিনি। তোমার ওপর পাহারার প্রয়োজন হবে না, আমি জানব—তুমি আমর ছেলে।

দয়ারাম : বটে !

মনোহর : পাকা উকীলের ঝুনো মাথা, হিসাব করেই কথা বলেছেন। শ্যামও রাখলেন, কুলও রাখলেন।

রেজাখাঁ : ঠিক বলেছেন ! কিন্তু গোড়াতেই যদি জানা যেত ইনি উকীল সাহেবের মেয়ে—

শান্তা : কি হত তাহলে সৈয়দ সাহেব ?

নাজির : ঝামেলা এভাবে গড়াতো না।

শান্তা : ঝামেলা তো আপনারাই পাকালেন গোড়ায় গলদ করে।

রেজা খাঁ : কিসে ?

শান্তা : এই তয়ফাওয়ালী নওরোজের গানের ভাবেই সেজে এসেছেন সবাইকে খুসী করতে। আপনারাই খামকা বললেন এঁকে—সঙ। আর উনি পাল্টা জবাব দিতেই আপনারা একেবারে রেগে টঙ ! যা নয় তাই বলে গালাগাল দিলেন।

নাজির : গালাগাল ত সাধ করেই ও শুনলে। এত বড় আস্পর্দ্ধা—বললে কিনা, আমরা সঙ !

শান্তা : মিছে কথা ত বলে নি—

রেজা খাঁ : হুঁসিয়ার—

নাজির : হুঁ—

শান্তা : নজীর ছাড়া আমি কথা বলি না সৈয়দ সাহেব !

রেজা খাঁ : বেশত, উকীলজাদীর সওয়ালটাই শোনা যাক্ !

শান্তা : তবে শুনুন—আপনাদের জনাব মুরশিদ কুলিখাঁ যখন সুবে

বাঙলার দেওয়ান, আর শাজাদা আজিমওসান সুবেদার নবাব-সেই সময় আলমগীর বাদশা তাঁকে লিখেছিলেন—

চিরা এ জাফরাণি বারসর ও হোল্লা এ এর গাওয়ানি
দারবর সেল্লে সরিফ চেহেল ও শাস আফরি
রেস ও ফস্।

অর্থাৎ—হলদে আর গোলাপী পোষাক ছ-চল্লিশ বছরের দাড়ির সঙ্গে মানায় না।—এরপর সাজাদা আর রঙিন পোষাক পরতেন না।

রেজা খাঁ ও আহম্মদ আলি স্ব স্ব পীত ও গোলাপী বর্ণের পোষাকের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিলেন। তাঁহাদের মুখ দিয়ে কথা বাহির হইল না।

দয়ারাম : ভারি তাজ্জব ত! সৈয়দ রেজা খাঁ আর নাজির আহম্মদ সাহেবদের পোষাকের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে যে!

নূরউল্লা : সাবাস্—উকীল সাহেবের বেটি?

শান্তা : আপনাদের দ্বিতীয় গলদের কথাও শুনুন। আমি স্বকর্ণে শুনিছি—নয়া নবাব ঢোল-সোহরতে সহরবাসীকে জানিয়েছেন—আজকের দিনে দিল খুলে সবাই নয়া বাগে নওরোজ উৎসবে যোগ দেবে—কায়দা-কানুনের কোন বাঁধাবাঁধি আজ থাকবে না। আমীরে ফকিরে পাশাপাশি বসবে—বেড়াবে। নালিস ফৈরদ উঠবে না আজ এখানে। গলতি-কসুর কারুর কিছু হলে—সরাসরি নবাবের সামনে গিয়ে জানাবে। এখন আপনিই বলুন খাঁ-সাহেব—কোন্ এক্তিয়ারে এই তয়ফাওয়ালীকে পয়জার মারতে রুখেছিলেন? আর আপনারাও বলুন—এতবড় একটা অনাচার চোখের সামনে দেখেও যে-সব মিঞা মুখ খেলেনা, হাত তোলে না—তাদের মানুষ বলা চলে?

রেজা খাঁ ও নাজির আহম্মদ অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া প্রথমটা স্তব্ধ এবং পরে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় দ্বারা যেন একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন। দয়ারাম,

মনোহর, নূরউল্লা, পীর আলি প্রভৃতি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন—কিন্তু ইহার মধ্যেই মনোহরের মুখভঙ্গি ও চাহনি দেখিয়া মনে হইল যে এই তেজস্বিনী মেয়েটির আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট তাঁহাকে অতিশয় মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

রেজা খাঁ : আমরা যে কি বলব ঠিক করতে পারছি না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না—ভুল করা যত বড় দোষ, চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেওয়া তত বড় গুণ। আমাদের কসুর এখন আপনার কথাতেই বুঝতে পেরেছি। আয়না বিবি, আমি মাপ চাইছি তোমার কাছে।

নাজির : আমিও তোমাকে কড়া কথা বলিছি বিবি, নবাব বাহাদুরের সোহবৎ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম ; তার জন্যে মাপ চাইছি।

আয়না বিবি : এ কোন মুস্কিলের ব্যাপার নয় সাহেব, আমি সব ভুলে গেছি—ইনিই আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছেন!

শান্তা : আমি! ভুলিয়ে দিয়িছি সব? তোমার অপমানের জ্বালাও! না-না, তাহলে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ বোন।

আয়না বিবি : ভুলের বোঝাই এতদিন মাথায় করে বহে বেড়িয়েছি দিদি, তুমিই নামিয়ে দিয়েছ। ভাবতুম দিদি—আমার রূপ আমার গান আমার নাচ যাদের আনন্দে মাতায়, আমার স্থানও বুঝি তাদের মাথায়। এই গরবেই সমান সুরে কথা বলতে গিয়ে বুঝলুম সত্যিই আমার জায়গা কোথায়! আর তুমি দিদি, নিজের গরবে জানিয়ে দিলে—তারা এক একটা জানোয়ার বই কিছু নয়। আমি আমোদ বিলিয়ে পেলুম লাঞ্ছনা, তুমি আক্কেল দিয়ে পেয়েছ সম্মান। আর নাচব না দিদি, তোমার কাছেই শিক্ষা নেব।

শান্তা : আর—আমি কি ভাবি জান বোন?

আয়না বিবি : (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া)—কি?

শান্তা : যদি তোমার মত নাচতে পারতুম!

আয়না বিবি : কি করতে তাহলে দিদি ?

শান্তা : সারা দেশটাকে নাচাতুম—নাচের গমকে রূপ তাদের বদলে যেত—বেরিয়ে আসত নাচতে নাচতে নূতন যুগের নূতন মানুষ।

আয়না বিবি : সত্যি ! শুনে যে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে দিদি ! কিন্তু,—কিন্তু সে নাচ ত আমি জানি না—

শান্তা : সেই নাচই তোমাকে শিখতে হবে বোন—এই হোক তোমার সাধনা।

নূরউল্লা : উপস্থিত একখানা নাচ ত চলুক—আসরটা যে ঝিমিয়ে পড়ল বিবিজান !

আয়না : এ-আসরে আমি আর নাচব না সাহেব, মাপ করুন আমাকে।

পীর আলি : থামকা ঝগড়া বাধালে তোমরা, মাঝ থেকে নাচটাই কোতল হয়ে গেল—ইয়া আল্লা !

নূরউল্লা : আরে মিঞাসাহেব কও কি ! নাচ যদি কোতল হয় তাহলে আজকের নওরোজ মেলাটাই যে কোতল হয়ে যাবে—

রেজা খাঁ : না—না,—তা হবে না, আয়না বিবি মেহেরবাণী করে আলবৎ নাচবেন।

নাজির :—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আসুন সব খাতির জমা হয়ে বসা যাক্—মজলিস হোক গুলজার।

মনোহর : নবাব বাহাদুরের আসবারও সময় হয়ে এল। এখন আর মন-কসাকসি ভাল নয়। নাচ তাহলে সুরু হোক।

আয়না বিবি : আমি নাচব না।

আয়নাবিবিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া রেজা খাঁ ও নাজির আহম্মদ রুখিয়া উঠিলেন এবং নূরউল্লা খাঁ বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া বাধা দিলেন।

রেজা খাঁ : নাচবে না ?

নাজির : তার মানে ?

নূরউল্লা : আহা—ওসব মানে-ফানের আর দরকার কি ! আমি বলছি, বিবিসাহেব নাচবেন, অবিশ্যি নাচবেন।

আয়না বিবি : জোর করে নাচাবেন ?

নূরউল্লা : আলবৎ। তবে গায়ের জোরে নয় বিবিসাহেব, এই বিবি ত আগেই বলেছেন—সে হিম্মত আজ কারুর নেই।

আয়না বিবি : তবে ?

নূরউল্লা : সুরের জোরে।—ভাবছো ঠাট্টা করছি, তা নয়। সুর-বাহারকে ছেড়ে দিচ্ছি দেখনা—তোমার পায়ে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে নাচাবে।

মনোহর : বল কি হে !

নূরউল্লা : হ্যাঁ হে দোস্ত, মস্করা করিনি—সত্যি। মীর্জ্জানগরী সুর-বাহার শুনলে কবর থেকে মড়া পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে। নাচের পাগুলো যেন ফরাসের ওপর দুরমুস পিটতে থাকে। নবাব বাহাদুরকে শোনাবার জন্যে সাথে করে এনেছি। বিবিসাহেবের মান ভাঙ্গাতে আগেই সুরু হয়ে যাক ! দেখি পা দুখানা নেচে ওঠে কিনা ! এই—সুরু কর, সুরু কর—সুরবাহার !

নির্দেশমত প্রচ্ছন্ন সুরশিল্পীদের ঐক্যতান বাদ্যের মধুর ঝঙ্কার উঠিল—সকলেই স্তব্ধ হইয়া সুরসুধা উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আয়না বিবির পায়ের নুপুর নিস্তব্ধই রহিল।

দয়ারাম : কি হোল হে ফৌজদার সাহেব, তোমার অমন মীরজানগরী সঙ্গত শুনেও আয়না বিবির পা-দুখানি নেচে উঠল না ত !

নূরউল্লা : তাজ্জব কাণ্ড ! মীরজানগরী সুরবাহার বাজলে মরা মানুষ জেগে ওঠে...

নূরউল্লার মুখের কথাটি এখানে থামিতেই এক ব্যক্তি যেন কলের মূর্ত্তিটির মত হাওয়ার বেগে আসিয়া কথাটার উপসংহার করিল। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ ; বেশভূষায়

বৈচিত্র্য এবং গোঁফদাড়ির পরিপাট্য প্রচুর। গোঁফ জোড়াটি মোচায় মত মোটা ও কাঁপানো, চাপ-দাড়ী চৌকাভাবে ছাঁটা। গায়ে পাকানো সাদা সুতার জালওয়ালা জামা সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্মের মত এখন আঁটসাঁট করিয়া আঁটা যে মানুষটির দেহসৌষ্ঠব তাহাতে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পাকানো সুতার সুশ্রী কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ার পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত আলম্বিত। দুই কাঁধে দুইখানা দীর্ঘ কোদাল, তাহাদের ফলা দুইটি পীঠের দিকে পড়িয়া চিক চিক করিতেছে। মাথায় ইস্পাতের তৈয়ারী টুপী; তাহার উপর খোদিত তারকাটি যেন জল জল করিতেছে। আগন্তুকের কথায় জানা যায় যে নাম তাহার বেল বাহাদুর। উদাত্তকণ্ঠে ফরাসী মিশ্রিত ভাঙ্গা বাঙ্গালায় তিনি কহিলেন:

বেল-বাহাদুর: আর—জ্যান্ত মানুষ সাড়া দিল না জনাব—এর চেয়ে বেশী আফশোস কি হ'তে পারে? তক্‌সির নেবেন না যেন খোদাবন্দ্—হুজুরের হুরমুৎ রাখবে বলে তাইদ দিতে বান্দা হাজির।

দয়ারাম: দেখ তামাসা! ফৌজদার সাহেব দেখছি রীতিমত তোড়জোড় বেঁধেই উৎসবে হাজীর হয়েছেন। সুরবাহার যেই খতম হলেন, অমনি এলেন দিলবাহার হুড়মুড় করে—

বেল-বাহাদুর: হুজুর হুরমুৎদার, কসুর মাপ করতে হুকুম হোক!

দয়ারাম: কসুর আবার কি হল? ওহে ফৌজদার সাহেব, চোখ পাকিয়ে দেখছ কি? তোমার দিলবাহার কি কয়?

বেল-বাহাদুর: বান্দা হচ্ছে—বেলদার; দিলবাহার দোসরা কৌন হোগা। হ্যাঁ, লেকিন ম্যয় দিলবাহার ভি হোনে সক্‌তা।

দয়ারাম: ফৌজদার সাহেব যে গোঁফে তা দিয়ে তামাসা দেখছ হে! এদিকে তোমার বাহার সেপাই নাম নিয়ে তুলকালাম বাধাচ্ছে।

নূরউল্লা: আলাপ হচ্ছে আপনার সাথে রায়সাহেব, ফৌজদার সাহেবকে মিছিমিছি টানছেন কেন? আমার দলে কেউ বেলদারও নেই দিলবাহারও নেই। তবে এক দেলোয়ার আছে, কিন্তু সে ত সিপাহিসালার। একে আমি চিনি না।

দয়ারাম: চেন না। আশ্চর্য্য ত! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—এ যেন

আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে চেনাতে চাইছে। ভাল কথা, লোক চেনবার লোকও ত এখানে আছে। শান্তা মা—

শান্তাকে এই সময় আয়না বিবির হাত ধরিয়া অনেকটা তফাতে উৎসবস্থলের অন্য প্রান্তে মহিলাদের বসিবার স্থানে চিকের সামনে দাঁড়াইয়া ভিতরের পর্দানশীন মেয়েদের সহিত আলাপ করিতে দেখা গেল। শান্তার দৃষ্টি চিকের দিকে থাকিলেও, এই প্রথম তাহার অঞ্চলটি মাথার দিকে খানিকটা উঠিয়াছে বোধ হইল। নাম শুনিয়াই সে ফিরিয়া চাহিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ ও চোখের উপরে যেন সঙ্কোচের একটা ছায়া পড়িয়াছে বুঝাইল।

দয়ারাম: তুমি ত মা চেহারা চিনতে ওস্তাদ,—এখন এই বেলদার বাবাজীকে দেখে কি মনে হয়? কোন একটা জানোয়ারের সামিল করে ফতোয়া দাও, শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

পীর আলি: বিবি সাহেব কি ফেতোয়া দেন শুনি—ইনি সের সিংহী গণ্ডার না জিরাফ?

শান্তা: তার চেয়ে কেন কোরাণ শরিফের ফতোয়া মনে করুননা সাহেব—'আজ বাহায়েম বাহরা দারম, আজ মালায়েক হাম!' আমাদের মধ্যে জানোয়ার আছে আবার ফেরেস্তাও আছে। নিজেরাই চিনে নিন না!

মুখখানা পুনরায় পূর্ব্ববৎ ফিরাইয়া লইয়া চিকান্তরালবর্ত্তিনীদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

দয়ারাম: এ যে উল্টা বুঝলি রাম গোছের ব্যাপার হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা ত গেল না।

মনোহর: আপনি কেন ঘাবড়াচ্ছেন! জানেন ত—চকচক করলেই সোনা হয় না। লোকটার কাঁধ দুটোয় কি ঝুলছে দেখুন না—ওরাই ত চোখে আঙুল দিয়ে জানাচ্ছে…

বেলদার: চাষা—চাষা—চাষা—এই তো জানাচ্ছে মোশয়,—তার সাক্ষী রয়েছে এই কুদ্দাল এই—ত?

কথাগুলি জোর গলায় উচ্ছ্বাসের সুরে বলিতে বলিতে লোকটি বিদ্যুদ্বেগে মনোহর রায়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই কাঁধ হইতে দুইখানি কোদাল লইয়া দৃঢ়হস্তে তুলিয়া ধরিতেই লোকটার উন্মত্তবৎ ভঙ্গি দেখিয়া মনোহর রায় এবং উভয়পার্শ্বে যাঁহারা বসিয়াছিলেন চমকাইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ পিছাইয়া বসিলেন।

রেজা খাঁ
নাজির আহম্মদ } (উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ।

দয়ারাম : তাইত! এ যে দেখছি কেঁচো খুলতে গিয়ে সাপ বেবোবার মত হ'ল হে!

রেজা খাঁ
নাজির আহম্মদ } (পুনরায় হাসিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মনোহর : একটা চাষা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তড়্‌ফাচ্ছে, আর আপনারা দিব্যি হাসছেন!

নূরউল্লা : হ'ত যদি আমার মীরজানগর—এই খোদার বান্দাটার মর্দ্দানী কোতল করতাম গর্দ্দানা নিয়ে।

বেলদার : হুকুম ফরমাইয়ে খোদাবন্দ! বান্দা ত হাজির, গর্দ্দানা কোতল করতে আপনার মর্দ্দানী ত জাহির করেন।

মনোহর : মহামান্য নবাবের কারপরদাজদের মনে রাখা উচিত— আমরা প্রত্যেকেই সম্মানী ব্যক্তি এবং আমন্ত্রিত।

বেলদার : এরেই কয়—মোল্লার দৌড় মসজিদের দরওয়াজা তক! আরে রাজা মোশয়—'রইস লোক ব'লে' তুমি পেয়েছ নওয়াব সাহেবের নেওতা, আর আমরা চাষা-লোক কিনা, তাই রবাহুত হয়ে এসেছি হেথা—এই কথা কও? সুধাও ওনাদের, তস্‌দিক মিলবে।

দয়ারাম : আহাহা—রায় সাহেব আপনি খামকা মাথা গরম করছেন। চাষাভূষোর কথা তামাসা ভেবে শুনতে হয়—তাতে মনের খোরাক পাওয়া যায়, আর মনটাও রসে ওঠে।

মনোহর : আপনি যাই বলুন রায় মশাই—আপনাদের নাটোরের কায়দা কানুন কি তা জানিনা, কিন্তু চাঁচলায় কোন চাষা কোদাল ঘাড়ে করে রাজবাড়ীর দেউড়ীর সামনেও দাঁড়াতে ভরসা করে না—রাজার সামনে এসে বেলেল্লাগিরি করাত মস্ত কথা।

বেলদার : ও! তাহলে কুদ্দাল শুদ্ধ তখুনি তারে জমির অন্দরে থুয়ে শাবড়ে ফেলা হত—যেমন ঐ জনাব গর্দ্দনা কোতলের কথা বললেন।

দয়ারাম : হ্যাঁ, আপনার কথার জবাব হচ্ছে রায় মশাই—নাটোর এখনো অতখানি এগুতে পারেন নি, হাজার হোক এক পুরুষে বড়লোক ত! আমাদের মহারাজার পিতাঠাকুর ছিলেন চাল-কলাবাঁধা পুরুত বামুন, আর মহারাজার কথা বোধ হয় শুনে থাকবেন—পুটিয়ার সত্রে খেয়ে মানুষ। আর আমি হচ্ছি জাতে তিলি, পাল্লা ধরে বেচতুম তিসি; অদৃষ্টের ফেরে দেওয়ানীর ধাপে উঠিছি। কাজেই, গোড়ার শিকড় আমরা কেউ ছিঁড়তে পারিনি।

বেলদার : বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ—

বলিতে বলিতে উচ্ছসিত উল্লাসে একেবারে দয়ারামের কাছে গিয়া গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে বলিলেন :

তাহলে ত মোরা এক জাতের মানুষ মোশয়! আমাদের রাজার দশাও ঐ রকম। বাপ চষত হাল, আর ছেলে কুদ্দাল ধরে মাটি কুপিয়ে মর্দ্দানী দেখাত। এখনো মাটিতে কোপ দিতে পেছপাও নয় মোশয়! আর, লজ্জার কথা কইমু কি মোশয়—চাষী-মুনীষদের মাঝ থেকে আড়াল ঘুচিয়ে এমনি করে গলা জড়িয়ে বলে ভাই—

ভাবের উচ্ছ্বাসে কথার সঙ্গে সঙ্গে দয়ারামের গলাটা হঠাৎ জড়াইয়া ধরিলেন।

দয়ারাম : আরে মেলো—আস্পর্দ্ধা দেখ, গায়ের উপর পড়ে গলায় হাত দিয়ে কথা কয়—আরে ছাড় ছাড়—ছেড়ে দে হতভাগা—বাপরে বাপ—

এই অবস্থায় প্রায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় আপন মনেই অন্যান্যদের কথা চলিল। যেমন:

মনোহর: কেমন, হলত!

নুরউল্লা: কুত্তাকে আস্কার দিলে—

পীরখাঁ: মাথায় চড়ে ব'সে।

রেজাখাঁ ও নাজির আহম্মদ বরাবর মুখ টিপিয়া কখন বা মুখ খুলিয়া হাসাহাসি করিতেছিলেন।

বেলদার এই সময় যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিয়াছেন এরূপ একটা ভঙ্গি করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বেলদার: এ, তুমি তাহলে পোড়া বাপের ছেলে মোশয়! বাত কও একেরকম, কাম কর আলাদা। ভুয়ো! মোর রাজা মোশায় যা কয়, তাই করে।

দয়ারাম: রাজার নামে ত লাল ঝরছে দেখছি! কে—কে—তোর রাজা কে শুনি?

বেলদার: কোদালে রাজা মোশয়—কোদালে রাজা! চাষায় কয় সীতা রাজা, আমীর বলে—সীতারাম।

দয়ারাম: তুমি তাহলে সীতারামের কারপজদার?

বেলদার: ভাই-বেরেদারও কইতে পার মোশয়।

মনোহর: সীতা রায়ের ভাই-বেরেদার না হলে এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়, আর—নবাব বাহাদুরের কারপজদাররা অমন করে হাসেন!

রেজাখাঁ: মাপ করবেন রায় সাহেব, আমরা এতক্ষণ মজা দেখছিলাম।

নাজির আহম্মদ: আর, মজার ওপর মজা এই—আমরা বরাবর হাসছি দেখেও আপনি ধরতে পারেন নি যে আসলে এটা সঙ!

কথাটা যেন আর সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল, এমন কি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই বেলদারটি পর্য্যন্ত। বিভিন্ন স্বরে অনেকে মুখ দিয়া অস্পষ্টস্বর যেন বাহির হইতে চাহিল—সঙ!

মনোহর : সঙ !

দয়ারাম : বটে !

নূরউল্লা : ভারি জবরদস্ত সঙ ত !

পীর আলি : খাসা—

বেলদার : খাঁ সাহেব তামাসা করছেন মোশয়। সীতে রাজার ভাই বেরেদার সহীদ হতে জানে—সঙ হয় না।

রেজাখাঁ : থামো, আমায় বলতে দাও। তামাসাটা খোলসা হয়ে যাক। আপনারা বোধ হয় শোনেন নি—এক ফকীর নওয়াব বাহাদুরের মাথায় খেয়াল চাপিয়ে দেয়—বিলকুল নয়া জায়গায় নওরোজের মেলা বসালে তবেই নয়া নওয়াবের মত কাজ হবে। বেহেস্তের মত এই গুলজার অঞ্চলটি—সেত রোজ। আগেও ছিল মস্ত এক জঙ্গল। এখানে চরা করে বেড়াত—শিয়াল সজারু নেকড়ে শূয়ার—

নূরউল্লা ও পীরআলি : তোবা—তোবা—

রেজাখাঁ : নওয়াবের হুকুম হল—তামাম জঙ্গল সাফ করে তলাও বানিয়ে নওরোজের আস্তানা করা চাই। কিন্তু এত জলদি এত বড় কাজ তামিল করতে কেউ রাজি হল না। তখন উকীল মুনিরাম রায় জানান যে, তাঁর তাঁবেয় বহুৎ মুনীষ মজদুর আছে তিনি নওয়াব বাহাদুরের হুকুম তামিল করবেন। সেই জঙ্গল ভেঙেই এই তলাও-বাগিচা হয়েছে। নওয়াব বাহাদুর খুসী হয়ে মজদুরদের নেওতা দিয়েছেন, হয়ত ইনামও দেবেন। তাই উকীল মুনিরাম বাবু তাঁর মুনিষদের এমনি করে সাজিয়ে এনেছেন। ইনি হচ্ছেন মুনিষদলের চাঁই—বেল বাহাদুর।

মনোহর : এই ব্যাপার !

দয়ারাম : ব্যাপারটা কিন্তু ভাববার মত। ঝুনো উকীলের মাথা কি

না, তাই বনজঙ্গল পুকুর কাটার কোড়াগুলোকে পলটনের সিপাই সাজিয়ে এনেছে নবাব বাহাদুরের কাছে বাহাদুরী দেখাতে।

মনোহর: বেশ ত, রেজাখাঁ সাহেব একে নবাব বাহাদুরের কাছেই পাঠিয়ে দিন না—আমাদের মাঝখানে এসেছে কেন?

বেলদার: ঐ ফৌজদার সাহেবের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্তেই জনাব!

নূরউল্লা: খবরদার বেয়াদপ! মুখ সামাল—

বেলদার: আরে জনাব, তোমার সুরবাহার কোতল হলো, তাই না বেল বাহাদুর এল দিলবাহার হয়ে, নাচের বাজনা বাজিয়ে মজলিসকে নাচিয়ে দিতে।

নূরউল্লা: বটে—তাহলে কার্দ্দানী তোমার দেখাও, দেখি, যদি খুসি করতে পার বিলকুল কসুর তোমার মাপ করা যাবে।

বেলদার: খোদাবন্দ মেহেরবান! কিন্তু খালি খালি কসুর মাপ করলে হবে না জনাব, ইনাম চাই।

নূরউল্লা: হবে, হবে। আগে কার্দ্দানী ত দেখাও।

বেলদার: কার্দ্দানী নয়, মর্দ্দানী—জনাবালী! তোমার আমিরী সুর-বাহারের সাথে মুনিষী বেলবাহারের সুরের কত আসমান জমিন ফারাক,—সেটা যাচাই করতে এখন হুকুম হোক! হো—বেলদার ভাইসব! ভাঁজো বেলবাহারী নাচের সুর—কোদালে কোদালে বেজে উঠুক মাদলের মাতুয়ালী।

পরক্ষণেই এক বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। দেখা গেল—বেলদারের অনুরূপ পরিচ্ছদ ও শ্মশ্রুগুম্ফধারী কতকগুলি বলিষ্ঠ পুরুষ পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া ঘণ্টাযুক্ত কোদালগুলি এমন অপূর্ব্ব কৌশলে চালনা করিতেছে যে তাহাদের সংঘাতে রণবাজের মত এক প্রাণোন্মাদক সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে এবং সেই মিলিত সুরের ঝাঙ্কার ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ হইয়া সমবেত সকলকেই যেন উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। সুরের

উত্তেজনা দেখিতে দেখিতে আয়না বিবির পা দুখানিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং রণনৃত্য মজলিসের সকলকেই উন্মাদনায় অধীর করিয়া তুলিল। বিভিন্ন কণ্ঠ হইতে উচ্ছ্বসিত স্বর নির্গত হইতে লাগিল ঃ

বিভিন্ন কণ্ঠে ঃ বা! বা! বা!—

বেলদার ঃ সাবাস—ছুটি ।

কলের পুতুলের মত যেমন মূর্তিগুলি আসিয়াছিস—'ছুটি' কথাটী শুনিয়াই তাহারা তেমনই অদৃশ্য হইয়া গেল। সমগ্র মজলিস স্তব্ধ, চমৎকৃত ; সকলে নির্ব্বাক। বেলদার এ সময় মজলিসের এমন এক প্রান্তে গিয়া সুন্দর সুগঠিত সুদৃঢ় দেহটীকে টান করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই সময় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একেবারে তিনি ফৌজদার নূরউল্লার সম্মুখে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। এখন যেন তাহার অগ্নিমূর্ত্তি।

বেলদার ঃ ইনাম—জনাব!

নূরউল্লা ঃ হাঁ, ইনাম তুমি চাইতে পার। এই নাও—

গলা হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া দিতে গেলেন—বেলবাহার পিছাইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

বেলদার ঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! জেবর! মুক্তোর সাতনরী হার!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বেলবাহারী সুর শুনেও ফৌজদার সাহেবের দিল সাফ হল না। আরে—ছো!

এ ঝুটা ইনাম বেলবাহাদুর ছোঁয় না জনাব!

ফৌজদার ঃ ঝুটো!

বেলদার ঃ রেসক্! কোদালের ঘা সইতে পারে?

ফৌজদার ঃ তবে কি চাও?

বেলদার ঃ সুরবাহার ছেড়ে বেলবাহারী সুর চালু করতে চাই আপনার মুলুকে। দিতে পারবেন?

নূরউল্লা ঃ হুঁ!

বেলদার: রইসে আর মুনীষে তরতফাৎ থাক্‌বে না—পারবেন এই ইকরার দিতে ?

নুরউল্লা: হুঁ !

মনোহর: বলুন না খাঁ সাহেব—চাষা মুনীষ গড়াগড়ি দেয় রাস্তার ধূলায়, আর রইস বসে হাতীর হাওদায়।

দয়ারাম: আরো আছে রায় মশাই—মুনীষ কাটে মাটি, আর রইস বসায় সিরাজীর ভাঁটি।

বেলদার: ঠিক, ঠিক ! এবার আমি হেরে গেছি।

দয়ারাম: বেশ, এখন একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি বেল বাহাদুর—ঠিক মত জবাব যদি দাও ভারি খুসি হই। আর...

বেলদার: বাস্—আর নয়। কথার সুর শুনেই বুঝিছি ইনামের কথা তুলবেন। তার চেয়ে আসল কথাটাই বলুন জনাব।

দয়ারাম: বেশ, তাই বলছি। কথা হচ্ছে এই—তোমার মনিবের এই কোদালে প্রীতিটা এল কোথা থেকে ! বাপরে বাপ—সবার পীঠে দেখি জোড়া কোদাল দোল খাচ্ছে। এর গোড়ার হদিসখানা কি বলতে পার ?

বেলদার: হদিস ত কেতাবেই লেখা আছে জনাব। রাম-রহিম হলেই রকমফের একটা কিছু করতেই হবে। নজীর ত সামনেই রয়েছে জনাব ! পরশুরাম সাহেব লাঠি সোঁটা ধনুক গদা সব ফেলে ধরলেন কুড়ুল। কেষ্টরাম চালালেন চর্কির মত এক চাকা। বলরাম বেছে নিলেন কিনা—লাঙল। এর পরেই এল সীতারামের পালা, সায়েস্তাখাঁর আমলের সুখ ফিরিয়ে আনতে বাংলা মুলুকের জান মান ইজ্জত বাঁচাতে বেছে নিলেন তিনি—কোদাল। আর দেওয়ান দয়ারাম বাহাদুর যেই দেখলেন ধরবার মতন আর হাতিয়ার কিছু নেই, তথন

মাথা খেলিয়ে কলম ধরে কেরামতী সুরু করে দিলেন। এর পর বোধ হয় এইটিই চালু হয়ে বাজীমাৎ করবে জনাব!

রেজা: জবর খোঁচা কিন্তু দিয়েছে দেওয়ানজী!

দয়ারাম: বল কিহে বেল বাহাদুর, কলমকে তুমি এত বাড়িয়ে দিলে!

বেলদার: না বাড়িয়ে কি করি বলুন জনাব, আপনি ত আর কলম ছেড়ে কোদাল ধরবেন না।

দয়ারাম: কোদাল ধরলেও ত তোমার মনিবের সাথে পাল্লা দিতে পারব না বেলবাহাদুর। জোড়া কোদাল কাঁধে বেধে বাইশশো কোড়া হামেসা নাকি তৈরী থাকে তাঁর শুনিছি।

পীর আলি: কেন থাকে সে খবরটি বোধ হয় শোনেন নি?

দয়ারাম: কিছু না। খবর যা কিছু আজই শুনছি।

পীর আলি: আশ্চর্য্য, সীতা রাজার আসল কথাই তাহলে শোনেন নি। রোজকার আস্নান আর পানের পাণি তাঁর নয়া তলাও থেকে আনা চাই। এক দীঘির পাণি দুদিন ছোঁবেন না। তাই বাইশ শো কোড়া কোদাল বেঁধে খালি খালি তলাও কেটে বেড়ায় সীতারাজা বাসি পাণি ছোঁয় না ব'লে।

দয়ারাম: বল কি হে! সত্যই এ যে নতুন রকমের খেয়াল!

মনোহর: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও খেয়াল আছে দাওয়ানজী, পীর খাঁ, বল বল, সেটাও বল—বাসি জলের মত কোন বাসি বস্তুই ওঁর ধাতে সয় না, মেয়ে মানুষ পর্য্যন্ত। তাই নিত্য নূতন ডবকা ডবকা নব যুবতীকে ধরে এনে—ল্যাংটো করে...

বেলদার: চুপ রও—রাজা। নিজের দৌলতখানায় চশমখোর হয়ে যা খুসি ব'ল, কিন্তু এটা মেলা-মজলিস, এখানে জানানা মহল আছেন। খবরদার!

মনোহর : কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—একটা চাষা মানী ভুঁইয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখা রাঙায়—

বেলদার : যান—নালিশ করুন গিয়ে ছাএল হয়ে নবাব বাহাদুরের এজলাসে এই বেল বাহাদুরের নামে। না হয়—ভরসা থাকে মেহেরবাণী করে সামনে আসেন! কুস্তি, কসরৎ, দঙ্গল, তলোয়ার, ঘুসি, মায় কোদাল পর্য্যন্ত—যা খুসি,—আসুন, ধরুন—যে বাজি মন চায়—বেল বাহাদুর সবতাতেই রাজি।

মনোহর : ছোটলোক গুলোকে বাড়িয়ে মাথায় তুলে চাষার ছেলে সীতারাম রায় দেশের যে সর্ব্বনাশ করেছে—নীচের এই স্পর্দ্ধা তারই নমুনা। আপনারা সাক্ষী রইলেন, এর বিহিত আমি করবই।

বেলদার : এ! একদম লালায়েক ভুঁইয়া! লড়তে চায় না—নালিস চায়; একেই কয়—নাস্থদ্নি।

মনোহর : কি বললি?

বেলদার : বললুম—নাস্থদ্নি। মানে বুঝতে পারলি নয়? এর মানে হচ্ছে—কুছ কামকা নহি।

এক নিশ্বাসে কথা কয়টি বলিয়াই দ্রুতপদে বেলদার চলিয়া গেলেন। ওদিকে শান্ত দেবীও এই সময় মাথায় আঁচলটী টানিয়া দিয়া দ্রুতবেগে অন্যদিকে অদৃশ্য হইলেন। আয়না বিবিও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

মনোহর : সৈয়দ রেজা খাঁ, নাজির আহম্মদ সাহেব, আপনারা উপস্থিত থাকতে সীতারায়ের এই ভাড়াটে গুণ্ডাটা আমাকে অপমান করল, আর আপনারা চুপ করে রইলেন।

রেজা খাঁ : চুপ করে থাকা ছাড়া কি করতে পারি বলুন রায় সাহেব! নওয়াব বাহাদুরের কাছে আজ রোজ আপনাদের চেয়েও ওদের খাতির জমা বেশী। আপনার পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই হাঙ্গামা বাধত, দলেও ওরা ভারি আছে।

মনোহর : তাহলেও একটা প্রতিবাদ করতে পারতেন ত।

নাজির আহম্মদ : আয়না বিবির সাথে আমাদের যখন ঝামেলা বেধেছিল, আপনারা কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন ?

মনোহর : বুঝেছি, তাই দুজনে বসে বসে মুখ টিপে হাসাহাসি করছিলেন। ঐ পাজিটার আস্পর্দ্ধা ত তাতেই বেড়ে গেল।

নূরউল্লা : এক একবার আমার ইচ্ছা হচ্ছিল—সিপাহিসালারকে ডাক দিই। কিন্তু নওরোজের দিনে একটা কেলেঙ্কারী হবার ভয়েই রাগটাকে সামলে নিলাম। নৈলে, লোকে অমনি রটিয়ে দিত—মীরজানগরের মানী ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ বাহাদুর—একটা চাষা মুনীষের ওপর চড়াও হলেন ! তাই না ঝামেলা আর বাড়ালাম না !

পীর খাঁ : ভালই করেছেন। রায় সাহেব অতটা গরম না হলেই ভাল করতেন। জানেন যখন—আজ এখানে মুড়ি-মিছরির সমান দর !

মনোহর : দেওয়াজী যে গুম হয়ে রইলেন ! একটি কথাও বলছেন না।

দয়ারাম : আমি আরো একটা গুরুতর কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—সেটাও ভাববার কথা।

মনোহর : এর চেয়েও কি গুরুতর ভাবনা এসে আপনার মাথার মধ্যে সেঁধুল।

দয়ারাম : আপনারা কেউ লক্ষ্য করেন নি বোধ হয়, বেলবাহাদুর শেষ কথা বলেই যেই ছুট দিল, ঐ শান্তা মেয়েটিও তখুনি মাথার ওপর ঘোমটা তুলে সুড়ুক করে সরে গেল !

মনোহর : নিজের অপমানের জ্বালায় এতটা চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম যে, লজ্জায় ওদিকে চাইতে পারিনি। তাহলে ত···

দয়ারাম : একটা রহস্য নিশ্চয়ই চাপা আছে, এখন খুলতে হবে তার ঢাকা—বুঝলেন ?

মনোহর : হুঁ!—আচ্ছা, ঐ বেলবাহাদুর লোকটা কে?

দয়ারাম : পীরখাঁ সাহেব ত সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরের কানাচেই থাকেন। আপনি এর নাম শোনেন নি?

পীরখাঁ : নাম শুনে ওখানে লোক চেনবার জো নেই দেওয়ানজী! নামের ওপর এমন সব আজগবী খেতাব চেপে বসে আছে, আসল মানুষকে চিনে বার করাই মুস্কিল। সীতারাজার বড় বড় জঙ্গীদের নামের নমুনা শুনবেন—মেনা হাতী, হামলা বাঘ, মেঘা ঘোষ, গুন্তো ষাঁড়, রূপো ঢালী, ফকির মাছকাটা, হরমুদ হার্ম্মাদা—এমন কত আছে। বেলবাহাদুর বোধ হয় বেলদার পল্টনেরই সরদার গোছ কিছু হবে।

দয়ারাম : হওয়া হউই নয় খাঁ সাহেব—খোঁজ নিতে হবে। ব্যাপারটাকে যা তা ভেব না। মনে রেখো, সঙ দেখতে এসে আমরাই এখানে সঙ হয়ে গেছি। চলো ওদিকটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক, কোন হদিস যদি পাওয়া যায়।

নূরউল্লা : তাই চলুন, নওয়াব বাহাদুরের আসতে এখনো গৌন আছে মনে হচ্ছে।

মনোহর : কিন্তু আমার কথা যেন মনে থাকে দেওয়ানজী। আমি জানি, নওয়াব বাহাদুর আপনাকেই সব চেয়ে বেশী পেয়ার করেন। এই ব্যাপার নিয়ে সীতারায়কেও যাতে নবাবের কোপ ফেলা যায়···

দয়ারাম : আসুন না এখন—সব হবে। সেই পরামর্শই ত করতে চাই। খাঁসাহেবরা খাতির জমা করে বসুন তাহলে—

রেজা খাঁ : চলুন চলুন আমরাও যাচ্ছি—

নাজির আহম্মদ : আপনারা এগোন—আমরা পথেই ধরব'খন। আর এখানকার মজলিস ও ভেঙ্গেই গেল। বিবিরাও সব উঠে যাচ্ছেন।

জয়ারাম, নুরউল্লা, মনোহর ও পীর খাঁ একসঙ্গে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। মহিলা স্থানও খালি হইয়া গেল।

রেজা খাঁ : বেড়ে রগড় হয়ে গেল কিন্তু—কি বল হে ?

নাজির আহম্মদ : সে কথা আর বলবে কি ! দেখলে না, আয়না বিবির ব্যাপারে মুখ ভার করে উঠে গেলেন সব !

রেজা খাঁ : তেমনি অপমান করে গেল সীতারামের ঐ কোদালওয়ালা !

নাজির আহম্মদ : এখন কৈফিয়ৎ চান—আমরা কেন রুখলাম না ! ব'য়ে গেছে।

রেজা খাঁ : মহামান্য জনবালি কুলি খাঁর হুকুমই বল, আর ফিকির বন্দেজ বা মতলবই বল—ভুঁইয়ায়-ভুঁইয়ায় যখন ঝামেলা বাধবে—টুঁ শব্দটি করবে না, চুপি চুপি ওস্কানি বরং দেবে তবু মেটাতে যাবে না। আজকের ব্যাপারে আমাদের চালটা চালা বেশ জবর হয়েছে নয় ?

নাজির আহম্মদ : শেষ দিকে হলেও গোড়ায় কিন্তু ভারি গলদ হয়ে গেছে।

রেজা খাঁ : সেটা হ'ল ত ঐ ভুঁইয়াগুলোর জন্যেই। দেখলে না—আমরা আসতেই সব মুখ ঘুরিয়ে বসল—উঠে পর্য্যন্ত গেল। সেই রাগ ত ঝাড়লাম ঐ আয়না বিবির ওপরে।

নাজির আহম্মদ : কিন্তু মুনিরামের মেয়ে আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল !

রেজা খাঁ : সেই জ্বালাই ত ইটের পাঁজাব আগুনের মত জ্বলছে—বুকের মাঝে। আবার বৈকুণ্ঠের খোঁটা দিয়েছে—একবার তার পানিতে যদি ঐ বকা ছুঁড়িটাকে নাকানি চোপানি খাওয়াতে পারি, তাহলেই দুরস্ত হয়ে যাবে।

নাজির আহম্মদ : চুপ্ চুপ্,—জাঁহাপনা—

রেজা খাঁ : যাঁ—

নাজির আহম্মদ : ঐ যে উকীল মুনিরাম বাবুর সাথে পাইচারী করতে করতে এদিকে আসছেন।

রেজা খাঁ : হুঁসিয়ার নাজির! শীগ্‌গীর—

নাজির আহম্মদ : হ'ল কি?

রেজা খাঁ : জনাব দেখতে পেয়েই চোখ ঠেরে আড়ালে দাঁড়াতে বললেন। এসো—জল্‌দি।

রেজা খাঁ ও নাজির আহম্মদ তাড়াতাড়ি একটা কুঞ্জের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই নওয়াব মুরশিদকুলিখাঁকে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাঁহার প্রায় পার্শ্বে থকিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিলেন মুনিরাম রায়। বর্ম্মাবৃতদেহ দুইজন শরীর রক্ষী ইহাঁদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নবাব এক নজরে দৃশ্যমান পরিমণ্ডলটী দেখিয়া লইয়া রক্ষীদ্বয়ের উদ্দেশে একটি অঙ্গুলি তুলিয়া সঙ্কেত করিতেই তাহারা বিভিন্ন দুইটি প্রান্তে সরিয়া গিয়া উৎসব ক্ষেত্রে প্রথিত দুইটি কদলী বৃক্ষে পীঠ দিয়া দাঁড়াইল। নবাবের পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বর নাই। সাদা পায়জামার উপর সাদা আচকান, তাহার উপর ঢাকাই মসলিনের সস্তরি। তাহাতে জরীর সূক্ষ্ম কাজ। মাথার উষ্ণীষটিও শুভ্র। সাদা মুক্তাগুলি উষ্ণীষের শুভ্রবর্ণ রেশমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কেবল মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ মরকত মণি তারার মত জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ হইলেও নবাবের দেহযষ্টি এখনও ঋজু সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মাথার চুল এবং শ্মশ্রুগুম্ফের অধিকাংশই পক্ক, কিন্তু মুখে এখনও বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়ে নাই। চক্ষু দুটি এত প্রদীপ্ত যে দপ দপ করিয়া যেন জ্বলিতেছে। মুনিরামও প্রায় নবাবের সমবয়স্ক। দেহ লম্বা এবং শীর্ণ হইলেও মুখখানি এত গম্ভীর ও ভারি যে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। মুখখানি যেমন ভারিভুরি, নাকটিও তেমনই চীলের চঞ্চুর মত তীক্ষ্ণ। চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র হইলেও বুদ্ধির জ্যোতি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে।

যদিও উৎসবস্থলের এই বিশিষ্ট অংশে নবাবের জন্য বিশেষ আসন স্বতন্ত্রভাবে ছিল কিন্তু নবাব আসন গ্রহণ করিলেন না; ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। মুনিরামই প্রথম আলাপ করিলেন :

মুনিরাম : এ দিকটা কেমন দেখছেন জাঁহাপনা?

মুরশিদ : তোফা। আমার আপনার নগর আপনিই চিনতে

পারছি না। মনে হচ্ছে যেন দুনিয়া ছেড়ে অন্য কোন জগতে এসেছি।

মুনিরাম। এক হপ্তা আগেও জাঁহাপনা এইখানেই শিকার করতে এসেছিলেন। তখনো ছিল দুর্গম জঙ্গল।

মুরশিদ: আর আজ সেই জঙ্গল সহরের সেরা বাগিচায় পরিণত হয়েছে। এখনো আমি ভেবে পাচ্ছিনে—এত বড় দীঘি এত জলদি তোমরা কি করে কাটালে!

মুনিরাম: জাঁহাপনা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবেন যে একটা পুরো দিনে এটা তৈরী করা হয়েছে।

মুরশিদ: তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু পানি এল কোথা থেকে?

মুনিরাম: গঙ্গা থেকে নালা কেটে এনে জোয়ারের জলে ভর্ত্তি করা হয়েছে জনাব!

মুরশিদ: এত জলদি এ কাজ হতে পারে—কেউ বিশ্বাস করেনি। সরকারী মাথাওয়ালা মুৎসুদ্দিরা পিছিয়ে গেল, আর কাজ ফতে করল এক বাঙালী ভুঁইয়া! কি নাম বললে তার?

মুনিরাম: সীতারাম রায়—জনাব!

মুরশিদ: সীতারাম রায়! সীতারাম ভুঁইয়া! হুঁ! কৌন সীতারাম?

মুনিরাম: যেস্‌কা উকীল মুনিরাম, খোদাবন্দ্‌!

মুরশিদ: হাঁ, হাঁ,—মনে পড়েছে। চাঁচড়া, নলডাঙ্গা, ভূষণা থেকে হামেহাল নালিশ আসত যার নামে নাজিম-দেওয়ানের এজলাসে, আর তোমার চোস্ত্‌ সওয়াল জবাবের কায়দায় বিলকুল খারিজ হয়ে যেত! হুঁ, মনে পড়েছে। কি নাম বললে বাবু মুনিরাম?

মুনিরাম: সীতারাম রায়।

মুরশিদ: হাঁ, হাঁ, সীতারাম রায়। আর খেতাব?

মুনিরাম : জনাব—

মুরশিদ : ওকি! খেতাব বলতে বাধছে কেন মুনিরাম বাবু—বলে ফেল।

মুনিরাম : মহারাজা—

মুরশিদ : ইয়া! ঠিক মিলে গেছে। হাঁ, হাঁ, ইয়াদ হয়েছে। এই লোকই সাহাজাদা আজিম ওসান সাহেবের আমলে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়েছিল—নয়?

মনিরাম : জাঁহাপনা—

মুরশিদ : হাঁ হাঁ—এই লোক, আলবৎ। সরাসরি দিল্লী গিয়ে খান-খানান নওয়াব সায়েস্তা খাঁ বাহাদুরকে সুপারিস ধরে আলমগীর বাদশার কাছ থেকে তামাম সোঁদর বন বন্দবস্ত করে নেয়, আর সব চেয়ে সেরা খেতাব বাগায়—কেমন? হাঁ—ইয়াদ হয়েছে। বহুৎ ওস্তাদ আর ভারি বাহাদুর ফেরেববাজ—হুঁ!

মুনিরাম : গোলামের গোস্তাকী মাফ করতে হুকুম হোক জাঁহাপনা!—সুবে বাঙলায় জনাবের শুভাগমন হবার আগে—রাজধানী যখন ঢাকায়, আর খানখানান সায়েস্তা খাঁ বাহাদুর নবাব-নাজিম অর্থাৎ সুবাদার,—তৎকালেই সীতারাম রায় সরকারের তরফে জান মান কবুল করে নওয়াব সাহেবের হুরমুৎ রক্ষা করেছিলেন।

মুরশিদ : আল্লা হো আকবর! সুবে বাঙলার নওয়াব সাহেবের মান-ইজ্জত কি জাহন্নমে যেতে বসেছিল যে, এক বাঙালী ভুঁইয়া হোল তার হুরমুৎদার! কি হয়েছিল শুনি?

মুনিরাম : জনাবালি অবশ্যই শুনে থাকবেন—খান খানান সায়েস্তা খাঁর আমলে পাঠান-সরদার করিম খাঁ বিদ্রোহী হয়ে সারা দখিন বাঙলা দখল করে। প্রজারা দেশভুঁই ছেড়ে পালাতে থাকে, চাষ আবাদ বন্ধ হয়ে যায়। ফৌজদারী ফৌজকে তিন তিন বার হারিয়ে দিয়ে

বে-পরোয়া হয়ে ওঠে করিম খাঁ। তখন নওয়াব সায়েস্তা খাঁ সাহেব সোহরত করেন—যে কোন ভুঁইয়া করিম খাঁকে জব্দ করতে পারবে, সারা নলদী পরগণা তাকে জায়গীর দেওয়া হবে।

মুরশিদ: হাঁ, হাঁ ইয়াদ হচ্ছে এখন—এক ভুঁইয়া নয়া পল্টন তৈরী করে করিম খাঁকে হারিয়ে তার শির কেটে এনে নজর দেয় নওয়াব সাহেবকে। তাহলে সেই বাহাদুর ভুঁইয়া হচ্ছেন,—তোমার মনিব সীতারাম রায়। নলদী পরগণা মফ্‌ত পেয়ে তার চারপাশের বহুৎ আয়মাল জব্দ করেছে। তারপর—দিল্লী চড়াও হয়ে খেতাব বাগিয়ে মহারাজা হয়ে বসেছে। আর—সেই লোকই—একদিনে এত বড় দীঘি বানিয়েছে। হুঁ—ইয়াদ থাকবে এর কথা—ইয়াদ থাকবে। ভাল কথা, তোমার খরচ খরচার হিসাব সব দাখিল করেছ?

মুনিরাম: জী-জনাব!

মুরশিদ: কিন্তু তা ব'লে, রাতারাতি আলাউদ্দীনের মোকাম তোলার মত এই তাজ্জব-ব্যাপার করে হিসেবের ব্যাপারেও যেন সেরেস্তাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ো না!

মুনিরাম: ছো! ছো! ছো! মহাভারত! মহাভারত! আল্লা জনাবকে সেলামতে রাখুন! অমন কথা বলবেন না। আমরা ত হিসাব দাখিল করতেই চাইনি!

মুরশিদ: ঐ না-চাওয়াটাই হচ্ছে পাকাপোক্তা ফেরেববাজির নিশানা মুনিরামবাবু! কাজ যেখানে হাসিল করে দিয়েছ, হিসাব পাওনা ছাড়বেই বা কেন? কোন ভুঁইয়া তার তালুকের খাজনা ঠিক মত ইর্সাল না করলে আমি ছাড়ি? তখনি পল্টন পাঠিয়ে তাকে ধরে আনা হয়। তার পর আদায় ব্যাপারে দুরন্ত সৈয়দ রেজা খাঁ আর নাজির আহম্মদআলি বৈকুণ্ঠের পানিতে

ডুবিয়ে পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত বুঝে না পাওয়া পর্য্যন্ত যে রেহাই দেয় না—সে ত জান? আমার সেরেস্তায়ও তাই কড়া হুকুম দেওয়া আছে—হিসাব মঞ্জুর হওয়া মাত্রই বিলকুল মিটিয়ে দেওয়া চাই।

মুনিরাম: এই জন্যই জনাবের সেরেস্তার এত খোসনাম।

মুরশিদ: বদনামের কথাটাও বল, নাইবা চাপলে। সেরেস্তা থেকে ওঠে খোসবু—যেখান থেকে বদবু ওঠবার কথা; আর—বৈকুণ্ঠ ছড়ায় বদবু- যার সুবাস বিলবার কথা। কিন্তু মজা এই—সবাই মেনে নিয়েছে মুরশিদ কুলিখাঁর এই কীর্ত্তিটাকে আইনের মত। কি বল?

মুনিরাম: জনাবের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমার তর্ক করবার স্পর্দ্ধা নেই।

মুরশিদ: এই জন্যই নওয়াবের দরবারে উকীল মুনিরামের এত খোসনাম, আর খাতির। হ্যাঁ—আর একটা কথা, দেখ—নিজের পাওনা-গণ্ডা আদায় নিতে যেমন গাফলতি হয় না, পরের পাওনা মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত- তেমনি স্বোয়াস্তি পাই না। তোমাদের আর একটা পাওনার কথা তুমিত তুললেই না, কিন্তু আমি ভুলিনি।

মুনিরাম: আর একটা পাওনা—আমাদের?

মুরশিদ: হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাদের। ঐ যে-সব মুনীষলোক আলাউদ্দীনের জীনের মত এসে এই বাগিচা বানিয়ে গেছে—আমি তাদের ইনাম দেব বলেছিলাম না?

মুনিরাম: জাঁহাপনা মেহেরবান! শুধু বলা নয়—আজকের উৎসবে যোগ দিয়ে ইনাম নেবার জন্য জনাব গোলামের মারফতে তাদের নিমন্ত্রণও করেছেন।

মুরশিদ: তারা এসেছে এখানে?

মুনিরাম: জী-জনাব, এখন এ-ব্যাপারে একটা আর্জ্জী আছে গোলামের।

মুরশিদ : তোমার মুখে আর্জ্জীর কথা উঠলেই নওয়াব ত্রস্ত হয়ে ওঠে মুনিরামবাবু! ভাল, বল কি আরজী?

মুনিরাম : মুনীষরা মহামান্য নবাব বাহাদুরের সামনে এসে ঝামেলা বাধায় এ আমরা চাইনে জনাব! কে কোথা থেকে বেফাঁস কিছু কথা বললে, আমাদেরই মাথা কাটা যাবে। তাই আমরা স্থির করিছি—ওদের পক্ষ থেকে একজন সরদার এসে জাঁহাপনার কাছে ইনাম নেবে—এই আরজি মঞ্জুর করা হোক।

মুরশিদ : কায়দা-কানুনে পাকাপোক্ত বলেই তুমি এই মাতব্বর আরজি পেশ করেছ। বেশ, মঞ্জুর। আর কিছু বলবার আছে?

মুনিরাম : আমার প্রভু সীতারাম রায়ের পিতাঠাকুর নওরোজের ঠিক পরদিনেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কাজেই, তাঁর আত্মার উদ্দেশে তাকিদ দেবার জন্যে—

মুরশিদ : উকীল মানুষ হলেই কি ঘরোয়া কথাও ভনিতা করে বলতে হবে মুনিরাম বাবু? সোজা কথাতেই বলনা কেন—বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তোমার মনিবের, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও নবাবের নিমন্ত্রণ রাখতে পারেন নি—এই ত?

মুনিরাম : জাঁহাপনা যে আমাদের শ্রাদ্ধও বোঝেন—

মুরশিদ : বুঝি না মানে? জাঁহাপনা হয়ে অবধিই যে তোমাদের শ্রাদ্ধটা চুটিয়ে চালিয়ে আসছি হে, তাই-ত ঐ শ্রাদ্ধের কথাটা আমি খুব ভাল ভাবেই জানি। ওয়াকিফহাল বলতে পার।

মুনিরাম : ভারি আশ্চর্য ত!

মুরশিদ : হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই মত! কত আর বয়স তখন, বছর দশ হবে বোধ হয়; বাপ-মা দু'জনেই এক সাথে দেহ রাখলেন, পৈতে হয়েছে তখন, নতুন ব্রহ্মচারী; গোদাবরীর তীরে

বাপ মাকে দাহ করে কাছা নিলুম গলায়। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করতে হবে—কিন্তু শ্রাদ্ধের কড়ি কে যোগাবে, পুরুত ঠাকুরের লম্বা ফর্দ্দ দেখে মূর্চ্ছা যাবার যো আর কি! তার পর কি শাসানি, সমাজের কি তম্বি! ছেলে যখন আমি—তার ওপর বামুনের ঘরে জন্মেছি—বাপ মার কাজ করতেই হবে—তা সে ভিক্ষে কর আর চুরি ডাকাতিই কর, যেমন করেই হোক শ্রাদ্ধের কড়ি চাইই। তখন নিজেকেই এক মুসলমান মহাজনের কাছে বিক্রী করে আনলুম টাকা, তাতেও পড়ল বাধা, সমাজপতিরা ফতোয়া দিলেন—বিধর্মী যবনের অর্থে শ্রাদ্ধ হবে না। শ্রাদ্ধ আর হল না। তখন পৈতে ছেড়ে লুঙ্গি পরে সেই মহানুভব মহাজনের ক্রীতদাস হতে হল। তারপর চাকা ঘুরে গেছে সে ত দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু শ্রাদ্ধের কথাটি এখনো মন থেকে মুছে যায় নি—কথাটা উঠলেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

মুনিরাম: জাঁহাপনার শৈশব কাহিনী শুনে আমিও অভিভূত হচ্ছি।

মুরশিদ: হ্যাঁ—যে কথা বলছিলাম। তোমার রাজা বাপের এবারকার শ্রাদ্ধটা এখানেই সারলে পারতেন। এখানে গঙ্গা আছে, তাঁরও মস্ত মোকাম রয়েছে। অসুবিধা কিছুই হত না, বরং মোলাকাত হোত এই সূত্রে।

মুনিরাম: তাঁরও ঠিক এই সঙ্কল্পই ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ত ঘ'টে উঠল না। জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হবার জন্য তিনিও একান্ত উদ্‌গ্রীব।

মুরশিদ: জাঁহাপনাও অল্প উদ্‌গ্রীব নয় মুনীরাম বাবু, বিশেষত এই আলাউদ্দিনী ব্যাপার সূত্রে। তোমার রাজা হচ্ছেন সাতোয়ান ভুঁইয়া, মালগুজুরী আখিরির আগেই ইরসাল করেন—কাজেই পল্টন পাঠিয়ে ধরে এনে যে মোলাকাত করব—তারও উপায় নেই। পরোয়ানা যে পাঠাব—আজ তক্ কোন উছিলাও তার পাইনি—

আর, উকীল মুনিরাম বাবু থাকতে সে ফুরসদও পাব না জানি। এই সব কারণেই ত মোলাকাত করতে এত বাসনা।

মুনিরাম: জনাবালির এই মর্জ্জির কথা আমি আমার মনিবকে জানাব। আল্লার ইচ্ছায় বান্দার প্রতি জনাবের এই মেহেরবাণী বরাবর বজায় থাকুক। এখন হুকুম হলে…

মুরশিদ: হ্যাঁ, মুনীষদের সরদারকে তুমি এখানেই জলদি পাঠিয়ে দাও মুনিরাম বাবু। এইখানে বসেই আমাকে এখানকার কাজগুলো সারতে হবে। আচ্ছা—

মুনিরাম কুরনিস করিয়া চলিয়া গেলেন; নবাব স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন:

উকীল মুনিরাম আর দেওয়ান দয়ারাম—দোনো রামকে নিয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম; এদের ওপরে এল—সীতারাম। এখন কোন রামকে সামলাতে হবে—সেইটেই সমস্যা…সৈয়দ রেজা খাঁ—

নবাবের আহ্বান শুনিয়াই যন্ত্র-চালিতের মত সৈয়দ রেজা খাঁ অকুস্থানে আসিয়া নবাবকে কুর্ণিশ করিলেন:

যে সব খবর এনেছ, চটপট বলে ফেল—খুব ছোট করে। আমার অনেক কাজ আছে।

রেজা খাঁ: সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে জনাবালি—উকীল মুনিরামবাবুর মেয়ে। বয়েস হয়েছে, বিয়ে হয়নি; হরেক দেশ ঘুরে হালে ফিরে এসেছ।

মুরশিদ: কি কসুর করেছে—তাই বল।

রেজা খাঁ: আমাদের বৈকুণ্ঠের ব্যাপারে বিষ ছড়াচ্ছে, মানুষকে খুঁচিয়ে তাতিয়ে তুলছে।

মুরশিদ: সে কি পরদানসীন নয়?

রেজা খাঁ: ওয়াজিব জানানা জাঁহাপনা! পরদা মানে না, বোরখা

পরে না, মাথায় ঘোমটা দেয়না, লজ্জা-সরমের কিনারা দিয়েও যায় না জনাব !

মুরশিদ : এমন ? কার সাথে যোগ-সাজস আছে মনে কর ?

রেজা খাঁ : এখনো তার সন্ধান পাইনি।

মুরশিদ : তল্লাশ কর। হ্যাঁ, শোন। মুনিরামের কন্যা যখন পরদানসিন নয়—লজ্জা সরম মানে না, পার ত আমার সামনে তাকে সুবিধা-মত হাজির করবে। কিন্তু হুঁসিয়ার, জোর জবরদস্তি চলবে না, আসতে চায় যদি স্বেচ্ছায়, আনবে। আমি তাকে পরখ করতে চাই। আচ্ছা,—আর কিছু খবর আছে ?

রেজা খাঁ : বাগিচা তৈরীর ব্যাপারটা বাহাদুরীর দিক দিয়ে ভারি বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে মুনীষদের মর্দ্দানীটাই যেন ছাপিয়ে উঠছে জনাব—হুজরালির দপদপাকে দাবিয়ে দিয়ে !

মুরশিদ : হুঁ! আর কিছু ?

রেজা খাঁ : চাঁচড়ার ভুঁইয়া রামদেব রায়, মীরজানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ, আর ভূষণার উজীর পীর আলি—এরা মিলে একটা দল বেঁধেছে। নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায় এদের খেলাচ্ছে।

মুরশিদ : আর নলডাঙ্গা ?

রেজা খাঁ : তিনি এদলে নয়।

মুরশিদ : সীতারামের দলে বোধ হয় ?

রেজা খাঁ। সম্ভব।

মুরশিদ : সন্ধান নাও। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। নাজির আহম্মদকে পাঠিয়ে দাও।

রেজা খাঁ চলিয়া গেলেন, একটু পরেই নাজির আহম্মদ আসিয়া কুর্ণিশ করিলেন

দল...দল। চির দিন ছিল, আর থাকবে। কিন্তু এই দল এক্তিয়ারের বাইরে গেলেই মুস্কিল—কি বল নাজির আহম্মদ আলি ?

নাজির আহম্মদ : হক কথা জনাবালি।

মুরশিদ : তোমাকে ভূষণার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। রেজা খাঁর কাছে শুনলাম—ভূষণার ফৌজদার সাহেবের উজীর পীর আলি চাঁচড়ার দলে ভিড়েছে। সত্যি নাকি?

নাজির আহম্মদ : সেই রকম ত দেখছি। তবে ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাপশা অগাধ জলের মাছ; নিজে ত আসেননি, পীরআলিকে তিনি পাঠিয়েছেন, এখানকার হাল চাল জানবার জন্যই মনে হয় জনাব!

মুরশিদ : সাজাদা আজিম ওসানের আমল থেকেই ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাপশা আমার বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে আসছেন। সাজাদার শ্বশুর বংশের সম্পর্কে আত্মীয়তার সুবাদ থাকায় দেমাকে মীর সাহেব উপরওয়ালাকেও মানতে চাননি। মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন—ভাগনে ফরক্সের বাদশাহী তক্তে বসলেই মামুকে সুবে বাঙলার মসনদে বসবার ফারমান পাঠাইবেন। শুনতে পাই, আমাকে ফাটকে রাখবার জন্য ভূষণায় একটা মজবুত রকমের কয়েদখানা পর্য্যন্ত বানিয়ে রেখেছেন। এখন হালে পানি না পেয়ে অগত্যা সুবে বাঙলার দেওয়ানীটা পাবার জন্যে তলে তলে চেষ্টা করছেন, আর আমাকে তোয়াজ করবার জন্যে পীর খাঁকে পাঠিয়েছেন।

নাজির আহম্মদ : জাহাপনার ধারণাই ঠিক।

মুরশিদ : আপাতত তোমাকে যশোরের ব্যাপারেই মাথা চালাতে হবে নাজির আহম্মদ।

নাজির আহম্মদ : জঁহাপনার ফরমাইস মাফিক কাজ করতে বান্দা জান কবুল করতে প্রস্তুত।

মুরশিদ : সীতারাম রায় আর মীর আবু তোরাপ—এই দুই মেজাজী ওস্তাদের ওপর কড়া নজর রাখবে তুমি। ভূষণা যদি চাঁচড়া, নল-

ডাঙ্গা, মীরজানগরের দলে মিশতে চায়—কুছ্ পরোয়া নেই, তাতে বাধা না দিয়ে বরং উস্কানি দেবে। কিন্তু হুঁসিয়ার—মহম্মদপুরের সাথে যেন তার মিতালী না হয়।

নাজির আহম্মদ: চেষ্টার কসুর হবে না জনাব! আর—জাঁহপনার মোতালকে হাত মক্স করে তফায়েৎ করবার কায়দা-কানুন এমনি রপ্ত হয়ে গেছে যে শরাকত সইতে পারি না! জমিদার হিস্যাদার তাঁবেদার এমন কি দোকানদার পর্য্যন্ত—ঘোট পাকিয়ে শরাকতি করছে দেখ্‌লেই বিগড়ে যাই, কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

মুরশিদ: তাইত তোমাকে বলছি—কড়া নজর রাখবে ভূষণা আর মহম্মদপুর যাতে শরাকত না ক'রে তফায়েত হয়ে যায়। যাক্, একটা জরুরী কাজ এখনো বাকি আছে। যারা বাগিচা বানিয়েছে, তলাও কেটেছে—তাদের ইনাম দিতে হবে। এই দলের সরদারকে এখনি চাই, এই খানেই।

নাজির আহম্মদ: সেই লোক এসেছে জাহাপনা। হুকুম হলেই—

মুরশিদ: তাকে আসতে বল এখানে। হ্যাঁ, তুমি যেতে পার।

নাজির আহম্মদ কুরনিশ করিয়া চলিয়া গেলে নবাব ইসারা করিয়া মর্ম্মরমূর্তির মতন দণ্ডায়মান রক্ষীদ্বয়কে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা কুর্নিশ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই নবাব বলিলেন:

মুরশিদ: নাজির আহম্মদ যে লোককে এখানে পাঠাচ্ছে আসতে দেবে। কিন্তু এর পর যদি কেউ এখানে আসতে চায় রুখবে; যাও।

কুর্নিশ করিয়া রক্ষীদ্বয় চলিয়া গেল।

নবাব পরিক্রমণ করিতে করিতে সদ্যোরোপিত ফুলগাছ হইতে একটি ফুল তুলিয়া আঘ্রাণ লইতে লইতে মখমল মণ্ডিত উচ্চ আসনটির উপর বসিলেন। এই সময় বেল বাহাদুরকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তিনি প্রথমে অতি দ্রুত আসিয়া মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীর সদর্পপদে অগ্রসর হইয়া সামরিক প্রথায় নবাবকে কুর্ণিশ করিলেন। নবাবও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মুরশিদ : তুমি ! তুমি সীতারাম রায়ের মুনীষদলের সরদার ?

বেলবাহাদুর : জী-জনাব। মহারাজা সীতারাম রায় তাঁর বেলদার-পল্টনের তরফ থেকে সরদার বেল বাহাদুরকে নবাব বাহাদুরের সামনে হাজীর হতে হুকুম করেছেন।

মুরশিদ : বেলদার পল্টনের তরফ থেকে ! হুঁ—তোমার মহারাজা বাহাদুর চাষী মুনীষদের নিয়ে পল্টন করেছেন নাকি ?

বেল বাহাদুর : নবাব বাহাদুরের সামনে হাজীর এই বেলবাহাদুরই তার নমুনা জনাব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে বেল বাহাদুর দুই কাঁধ হইতে ঘণ্টাযুক্ত দীর্ঘ দুইখানি সুচিক্কণ কোদাল দুইহাতে সমান্তরাল ভাবে সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিলেন—কোদালের মাথায় বাঁধা ঘণ্টাগুলি গভীর শব্দে ঘন ঘন বাজিয়া উঠিলে নবাব চমকিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই বলিষ্ঠ পুরুষটির আপাদমস্তক দেখিতে লাগিলেন।

মুরশিদ : কি ও দুটো—কুদ্দাল ?

বেল-বাহাদুর : জী—জনাব,—কুদ্দাল। আল কাটে, খাল কাটে, জঙ্গল ভেঙ্গে বিলকুল সব সাফ করতে এর আর জুড়িদার নেই। এই বাগিচা, ঐ ঝিল—পয়দা করেছে এই কুদ্দাল। মুনীষ লোকের সেরা হাতিয়ার, রইস লোকের জবরদস্ত্ দুষ্‌মন।

দুই হাতের দুইখানা কোদালের মাথা দুইটী সংযুক্ত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয় পুনরায় সযত্নে দুই কাঁধে রাখিলেন।

মুরশিদ : রইস্ লোকের দুষমন কেন ?

বেল-বাহাদুর : ঝামেলা লাগাতে এলে নাজেহাল করে হটিয়ে দিতে—এরা ভারি মজবুত জনাব।

মুরশিদ : এক দিনে তোমরা এত বড় দিঘি কি করে কাটলে ?

বেল বাহাদুর : এই কুদ্দাল জানে জনাব !

মুরশিদ : কত মুনীষ মিলে তোমরা এ কাজ করেছ ?

বেল বাহাদুর : রাজা জানে, জনাব !

মুরশিদ : তুমি জান না ?

বেল বাহাদুর : আমি জানি শুধু জনাব, আমার রাজার হুকুম তামিল করতে। কাজে যখন মাতি—আমি মাটি কুদ্দাল—তিনে মিলে কসরৎ চলে ; দিল বলে খালি—এগিয়ে চল্ কুদ্দালী—এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল ! গোণাগুণতির ফুরসদ কোথায় জনাব ?

মুরশিদ : তাহলে ইনাম মিলবে কি করে ?—গোণাগুণতির ফিরিস্তি না দিতে পার যদি—

বেল বাহাদুর : হাঃ হাঃ হাঃ—

মুরশিদ : হাসছ যে বেয়াদপ !

বেল বাহাদুর : বেয়াদপি মাপ করতে হুকুম হোক, ফিরিস্তির কথা শুনে না হেসে পারিনি জনাবালি।

মুরশিদ : হাসবার কারণ ? কি সূত্রে অত হাসি ?

বেল বাহাদুর : ব্যথা যখন দিলের এইখানে আটকে যায় জনাব, উঠতে চায় না, চোখের পানি তখন উপে গিয়ে হাসি হয়ে ফুটে বেরিয়ে আসে। আমার হাসিও তাই—বুক ফাটা হাসি।

মুরশিদ : হঠাৎ ব্যথা কিসে এল ?

বেল বাহাদুর : জনাবের কথায়। নওরোজের পার্ব্বনে সুবে বাঙলার নয়া নওয়াব ইনাম দেবার একরার করে মাথা গুণতি করতে চান ! তার চেয়ে মাথা নুইয়ে দিচ্ছি জনাবের সামনে—কোতল করবার হুকুম হোক। এই কুদ্দালী হোক নওরোজের কুরবানি।

মুরশিদ : আল্লা হো আকবর ! তুমি ত দেখছি ভারি মুস্কিলে ফেললে আমাকে। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু বাপু, তুমি যদি বুঝে থাক—নওরোজের দিনে নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ ইনাম দেবার কথা দিয়ে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে—তাহলে সে বোঝাটা ঠিক নয়—বিলকুল ভুল। বেশ, তোমাদের মাথা গুণতি করে

ইনাম নাই বা দিলুম। বল তুমি কি ইনাম চাও। তোমার দলের জন্য ইনাম ছাড়া তোমার ইনাম আলাদা। বল ইমানদার, কি তুমি চাও? কি পেলে খুসী হও বল—আমি তাই দেব।

বেল-বাহাদুর: জাঁহাপনা মেহেরবান, গরীব পরোয়ার, আল্লা জনাবকে সেলামতে রাখুন। কিন্তু খোদাবন্দ, এ বান্দা যে দলছাড় নয়! আবার এমনি তাজ্জব—আমাদের দল জাত ছাড়া নয়, জাতটাও দেশ জোড়া জনাবালি! তাহলে বুঝতেই পারছেন—বান্দার ইনাম হচ্ছে দলের ইনাম, জাতের ইনাম, সেই সাথে সারা দেশের ইনাম।

মুরশিদ: ওঃ! একরার করে এত বড় ফ্যাসাদে বুঝি কখন পড়িনি! ও-খোদা!—হ্যাঁ, দলের কথা আগেই শুনিছি, এখন তুলছ জাত। এইখানেই দেখছি মস্ত সমস্যা। দলশুদ্ধ সবাই তোমরা এক জাত?

বেল-বাহাদুর: জী-জনাব, এক জাত—দলকে দল সবাই।

মুরশিদ: ভারি আশ্চর্য্য ত! কিন্তু এমন ইনাম আমি দেব না—দিতে পারব না—যা হবে জাতি বিরোধী। তোমাদের দুসাধ্য কাজে খুসি হয়ে যেমন ইনামের একবার করিছি, আজ নওরোজের দিনে তেমনি ইস্তাহার দিয়েছি—জাতিধর্ম বিরোধী কোন অনুষ্ঠান এখানে হবে না। বুঝে কর ইনামের আরজ।

বেল-বাহাদুর: একটা লোক যেখানে দলের মাথা, একটা দল নিয়ে যেখানে জাত, আর সেই জাতের সাথে জড়িয়ে আছে দেশ—সে লোক জীভ ছেঁটে ফেলে দেবে কুদাল দিয়ে—তবু এমন কিছু চাইবে না জনাব, যা হবে জাতের কাছে দুষমণি।

মুরশিদ: সাবাস! বড় বড় আলেম মৌলভি পণ্ডিত—ধর্মের সমস্যা নিয়ে যারা দুনিয়া তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, তুমি বেল-বাহাদুর দুটো কথায় তাকে এড়িয়ে চলেছ! বা! বেশ ত! শুনেছিলাম—সীতারাম রায় ভারি এলেমদার। তার মহম্মদপুরে যতগুলো চতুষ্পাঠী, তত-

গুলো মক্তব। তাই বোধ হয়—তার মুনীষরাও সবাই বিদ্যার জাহাজ। আমি খুসি হয়েছি তোমার কথায় বেল বাহাদুর। বেশ, বল, কি ইনাম চাও তুমি।

বেল-বাহাদুর: আল্লা জাঁহাপনাকে এন্তেকালতক সুখে রাখুন। জনাবের ইনসাফ, একরার, আদালত, মেহেরবাণী—সবার জবানের বিষয় হোক। আজ নওরোজের পর্ব্বদিনে নাতান জাতির মুখের পানে চেয়ে জনাবালী এই কুদ্দালের ইজ্জত বজায় রাখুন।

মুরশিদ: কুদ্দালের ইজ্জত!

বেল-বাহাদুর: জী-জনাব! এক দিনে এরা তলাও কেটে মাটির পাহাড় সাজিয়ে রেখেছে। এখন হুকুম হোক জনাব—এক ঘড়ির ভিতর সৈয়দ রেজা খাঁর তিন মাসে কাটা—বৈকুণ্ঠ তলাও ভরাট করে আর এক বাগিচা সাজিয়ে তুলি এই ইনাম আমি চাই। এতেই কুদ্দালের ইজ্জতের সাথে জাতের ইজ্জত বেঁচে উঠবে জনাব!

প্রার্থনার কথাগুলি নবাবকে প্রথমে স্তব্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণে মুখে চোখে দারুণ উত্তেজনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেই আসন হইতে উঠিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার তুলিয়া তিনি নিম্নে নামিতে লাগিলেন

মুরশিদ: কি-কি, কি—বললে তুমি! একটি খেয়ালের ঝোঁকে এই ইনাম চেয়ে তুমি সুবে বাঙলার নবাবের ইজ্জত মাটির তলায় চাপা দিতে চাও! বেয়াদপ—বেওকুফ—

বেল-বাহাদুর: উত্তেজিত হবেন না জনাবালি! ধীর চিত্তে ভেবে দেখুন—লাঞ্ছনার নরককুণ্ড সৃষ্টি করে যাকে নবাবী ইজ্জতের স্তম্ভ বলে গর্ব করছেন, তার প্রতি রন্ধ্র দিয়ে উৎকট একটা পুতিগন্ধ উঠে বাঙলার আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে, বিষের বিশ্রী ধোঁয়া উঠে সমগ্র জাতির জীবনশক্তি বিষাক্ত করে তুলেছে; মনুষ্যত্বের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে—দুর্গত জাতি একটা মানুষের মূর্ত্তি

ধরে এসে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাইছে—ওগো রাজা, নওয়াজের এই শুভ-দিনে জাতির মুখের কালি দাও মুছে ; ভেঙে ফেল ঐ লাঞ্ছনার স্মৃতি স্তম্ভ ; বুজিয়ে দাও জাতির বুকের উপর তৈরী করেছ যে নরক-কুণ্ড !—এই আমাদের ইনাম, জাতির দাবী।

মুরশিদ : সবুর। আমার মনে হচ্ছে—তোমার কথা শুনে দেশটাই না খাড়া হয়ে উঠে আসে।—আরজি তোমার মঞ্জুর বেল-বাহাদুর। ভরাট কর—বৈকুণ্ঠ,—ইনাম দিয়ে আমি হলাম মুক্ত।

বেল-বাহাদুর : বন্দেগী জনাব—মোতামুল-উল্‌-মূলক্ মহম্মদ আল্লা-উদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসিরজঙ্গ নওয়াব বাহাদুর !

মুরশিদ : দাঁড়াও।—সোজা হয়ে দাঁড়াও আমার সামনে। বল—তুমি কে ?

বেল-বাহাদুর : জনাব !

মুরশিদ : চেহারায় ফেরেববাজি করেও ভাষার হের-ফেরে ধরা পড়ে গেছ বাহাদুর ! বল তুমি কে ? তারিফ্ করছি তোমাকে—মুরশিদ-কুলি খাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তুমি ধাঁধা লাগিয়েছিলে। বল তুমি কে ?

বেল বাহাদুর : পরিচয় ত আগেই দেওয়া হয়ে গেছে জনাব, একটা দল, একটা জাতি, একটা ধর্মের প্রতিচ্ছবি—বাঙলা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুরশিদ : সেই হেঁয়ালী ! আচ্ছা, যদি জিজ্ঞাসা করি—কোন দল ?

বেল-বাহাদুর : জবাব পাবেন জনাব—চাষী-মুনীষ।

মুরশিদ : জাতি ?

বেল-বাহাদুর : বাঙালী।

মুরশিদ : আর ধর্ম ?

বেল বাহাদুর : মাটির কসরৎ। আর, এদেরই নিয়ামক হচ্ছে—এই কুদ্দাল।

মুরশিদ : সত্যই তুমি বাহাদুর। খুসি হয়ে তোমাকে একটা ইনাম দিয়ে দিল ভরছে না ; দোয়েম ইনাম দিতে চাই তোমাকে।

বেল-বাহাদুর : তবে হুকুম হোক জনাব, উৎসবমত্ত নগরবাসী কালই প্রত্যূষে শুব্ধ হয়ে যেন শোনে—মহিমাময় নবাব লোকচক্ষুর আড়ালে সৈয়দ রেজা খাঁর কুকীর্ত্তি চাপা দিয়ে—তারই উপরে রাতারাতি সাজিয়েছেন এক অপূর্ব্ব ফুলবাগান। নাম হবে তার ফররাবাগ—

মুরশিদ : রেজা খাঁর বৈকুণ্ঠ ভরাট করে রাতারাতি ফুল বাগান—নাম পর্য্যন্ত পাকা হয়ে আছে ?

বেল-বাহাদুর : কাল প্রত্যূষে জাঁহাপনাই ফররাবাগের দরওয়াজা খুলে নগরবাসীকে ধন্য করবেন।

মুরশিদ : বেশ, আমি সম্মত হলাম। মঞ্জুর করলাম তোমার আরজি। মেনে নিলাম নয়া ফররাবাগের দরওয়াজা খোলবার নিমন্ত্রণ—মুনীষ-সরদার বেল-বাহাদুর।

বেল-বাহাদুর : শ্রদ্ধার সঙ্গে এখন আপনাকে সালাম করছি জনাবালি—সুবেদার বাহাদুর বলে নয়, সত্যকার দরদী মানুষ বলে।

মুরশিদ : আমিও খুসী হয়ে আলেকম সালাম জানাচ্ছি বাহাদুর, তোমাকে নয়—তোমার ঐ কুদ্দালকে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলা-বিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্ম্মল আকাশ-তলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয় ভাব—কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা-আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ-নিবাসী স্কচ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেই রূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে; নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্‌সপীয়ার উচ্চ কবি হইয়াও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক সকল বিয়োগান্ত-জনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। দার্শনিক জার্ম্মাণ সিলার, নাটকে ভার্জ্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্‌ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে সেক্‌সপিয়ারের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দ্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটক-সকল, প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেকস্‌পীয়ারের "টেমপেষ্ট" নাটকের সহিত কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের বারবার তুলনা হইয়া থাকে। "টেমপেষ্ট" বায়ূ-বিহারীদেহী ও কুহক আশ্রয়ে রচিত।

"শকুন্তলা" ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্কপ্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়; যথা—এলিজাবেথের সময়ে নাটক সকল 'দ্বিতীয় চার্লস'এর সাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকালপাত্র-উপযোগী, সেই হেতু ভিন্নদেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হয়, তাহা দর্শকের মন কত দূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্যপ্রদেশে অনুবাদিত শকুন্তলা দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ীরূপে গৃহীত হয় নাই বা হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মূর যোদ্ধার প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেসডিমোনার পিতৃ-গৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেকস্‌পীয়ার বর্ণিত "ওথেলোর" মুখে অনুরাগচিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী বর্ণনা সেকস্‌পীয়ারের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপিত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভাহার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এ জন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীর-জাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক ও ধর্ম্ম-সম্মান-কারী নায়ক, হিন্দুহৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থিরগম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। এ দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা, ব্যাভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধিচী আদর্শ ত্যাগী ও অতিথি সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মলতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ক্রটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতালপ্রবেশী জানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্তা নায়িকা "যেন রাম আমার জন্ম জন্মান্তরে স্বামী হন" এ কথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে

পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দিয়া তাঁহার চলে, এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূরদেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাসগুরু ফিল্ডিংএর "টম জোন্‌স" তাহার উদাহরণস্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এক কালে দিতে বাধ্য নন। পাঠকের কৌতূহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আকাঙ্ক্ষার সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়ালটার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয় প্রাপ্ত, তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন 'মারচ্যাণ্ট অফ্ ভিনিস' এ সাইলক, বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এ স্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞবেশে 'পোরসিয়া' উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের

এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ-শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্ম-গোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্বাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আমূল গল্প করিতে হইবে। তুলিকা, স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করেন, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তিচালিত-লেখনী—চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে,—ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনা করে, কিন্তু নাট্য কবিকেও পাখীর গান, ভ্রমরগুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। "রোমিও-জুলিয়েট"এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়,—হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারিসিঞ্চন, ভ্রমরগুঞ্জন-বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমরগুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ শিখাধারী কবি কালিদাস নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্যকৌশলে অলক্ষিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত বিষপাত্র পান করিলেই চলিবে না। "হ্যামলেট" আত্মহত্যা করিবে কি না, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে

কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ "take up arms against a sea of troubles" রূপ জড়িত উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীন নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীন করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি নৈকট্য সম্বন্ধ হইলেও, যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্মনির্ম্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রীচরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে "অ্যানির" হৃদয়, তাহাও নির্ভীকচিত্তে প্রদর্শিত করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ—লাভ নয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম একটী উচ্চ ব্যবসায় হইত, ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম, ইহা দেখাইয়া, সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও, তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়, ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও, তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়, আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্যপালন ফলে—অমরত্ব নিশ্চয় লাভ করিবেন।

নাটক ও তাহার অভিনয়

(৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট নাটকাদির অস্তিত্ব থাকিলেও বর্ত্তমান বাঙ্গলার নাটকাদি বিলাতী নাটকেরই অনুকরণে রচিত হইয়াছে।

যাঁহাদের দ্বারা বঙ্গে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং সেই সময় হইতে আজও পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষায় নাটক লিখিয়া আসিতেছেন, সকলেই অল্প বিস্তর ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, সকলেই পাশ্চাত্য নাটকাদির কিছু না কিছু রস গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই পাশ্চাত্য নাট্যকার, বিশেষতঃ সেক্‌স্‌পীয়ার—এখানকার কবিগণের নাটক রচনার প্ররোচক। সেইরূপ ইংরাজী নট এদেশে আসিয়া, সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাদির অভিনয় দেখাইয়া এখানকার মনীষিগণের মনে বর্ত্তমান যুগানুযায়ী অভিনয় প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখানকার নাটকের কথা বলিতে হইলে পাশ্চাত্য নাটকের,—এখানকার অভিনয়ের কথা বলিতে হইলে পাশ্চাত্য অভিনয়ের—কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের ইতিহাস আমি যতটুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় জীবন যেন অনেকটা জড়িত। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, জাতীয়ত্বের প্রথম পবিত্র সমুজ্জ্বল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্য-কুসুমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকসিত হইয়াছে। এমন কি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী কাহার প্ররোচক, তাহাও অনেক সময়ে উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের একটী সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতির গঠন হয়। সেই সূত্রটী ধরিয়াই আবার নাট্যকলা লীলা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে স্থূল

দৃষ্টিতে যদিও তাহা সকলের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু একটু গবেষণার সহিত নিরীক্ষণ করিলে সে সূক্ষ্ম সূত্রটী দৃষ্টি গোচর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস ; এমন কি সাধারণ আমোদ-উল্লাসপূর্ণ নাটকাদি তাহাদের স্থূল বহিরাবরণ দিয়াও সে সূত্রের অস্তিত্ব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই গ্রীক নাট্যসাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। জাতীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই রোমীয়-সাহিত্য গ্রীসের পথানুসরণে সমর্থ হইয়াছিল। ফরাসীদেশেও নাট্য সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে। "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী" তখন ধর্ম্মরূপে ফরাসীজাতির হৃদয়ে রাজ-বিদ্বেষ-বহ্নি ধীরে ধীরে প্রধূমিত করিতেছিল। ইংলণ্ডেও ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছে। যে সময়ে ইংলণ্ডের নব সংস্কৃত ধর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নবাভ্যুদিত জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়া, স্পেন সম্রাটের প্রচণ্ড নৌবাহিনী ইংলণ্ডের উপকূলে তাহারই ক্ষুদ্র নাবিকগুলির শক্তি সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই মহাকবি সেক্‌সপীয়র তাঁহার নবরচিত ভুবনামোদিনী পুষ্পমালা মাতৃভূমিকে উপহার দিয়াছিলেন।

কিন্তু নাটক ও নটচর্য্যা অভিন্নাত্মক হইলেও, ইংলণ্ডে দুইটীই এক সময়ে সমান স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। তা যদি হইত, তাহা হইলে মহা-কবির অস্তিত্ব লইয়া আজও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে বিতর্ক চলিত না। এখনও পর্য্যন্ত লর্ড বেকনের আত্মার প্রতিভা 'হ্যামলেট' 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতির স্বত্বাধিকার লইয়া বিলাতের সাহিত্যিক-মহল গণ্ডগোল করিতেছেন। তামাদি আইনে অধিকারচ্যুত না হইলে, বেকনের ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন না হইত, তাহা কে বলিতে পারে? কবির জন্ম ভূমিতে স্মৃতি মন্দির রচিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার জন্ম দিন লইয়া

অগণ্য উৎসব কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও সেক্‌স্‌পীয়ারের নির্দ্দিষ্ট আসনে বেকনকে বসাইতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

ইহার প্রধান কারণ—যে সময় সেক্‌স্‌পীয়ার নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় নাট্যাভিনয় লোক-সমাজে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকগণের ভিতরে সম্যক আদৃত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাটক ও নাটকাভিনয় একরূপ অভিন্নাত্মক। নাটক ক্রিয়াচিত্র—নটচর্য্যায় সেই ক্রিয়াচিত্রের উপলব্ধি। পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া উভয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। অনভিনীত নাটকের প্রচ্ছন্ন-নাটকত্ব লইয়া আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি, কিন্তু যে নাটক অভিনয়ে কখনও স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তাহা ভাব-গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ হইলেও কাব্য-সাহিত্য, নাটক নহে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত চিত্রকরের অমার্জ্জিত কলাকৌশল অভিনয়-নৈপুণ্যে যদি জীবিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহা সাহিত্যে স্থান না পাইলেও নাটক।

অভিন্নাত্মক হইলেও ইংলণ্ডে নাটক ও তাহার অভিনয় সমসময়ে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। কবি কালস্রোতে প্রস্ফুটিত পুষ্প স্তবকের ন্যায় কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে যেন ভাসিয়া আসে। নিশ্চিন্ত জলাবগাহী উপকূলবাসী জলে ডুব দিয়া আবার মাথা তুলিতে দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহা শিরঃসংলগ্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডবাসীর সেক্‌স্‌পীয়ার-প্রাপ্তি সেইরূপই হইয়াছিল।

তখন দেশে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাতে যাঁহার ব্যুৎপত্তি না থাকিত, তিনি পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইতেন না। এই দুই ভাষাই তখন সাহিত্যিকদিগের অবলম্বন ছিল। সেক্‌স্‌পীয়ার এই দুই ভাষাতে একরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কিছু পুর্ব্বে অভিনয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক লইয়া হইত, এবং তাহা ধর্ম্মযাজকগণের একরূপ একায়ত্ত ছিল। অধিকাংশ অভিনয় ল্যাটিন ভাষাতেই সম্পন্ন হইত।

জাতীয়ভাষায় রচিত পুস্তক সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়াকর্ষণ করিলেও, পাণ্ডিত্যাভিমান তাহাকে সাহিত্যের গণ্ডির বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিত।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, সে সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এখনও যদি কাহারও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকে, তিনি পণ্ডিত সমাজে সম্যক্ আদর পান না। বঙ্গভাষায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেও ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের অভাবে কোনও ব্যক্তি পূর্ণ পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। পাণ্ডিত্যের এই বিধিবন্ধন, সৌভাগ্য ক্রমে, আজকাল অনেকটা শিথিল হইলেও, এখনও লোকের মন হইতে তাহা সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে ইংরাজীভাষারও তখন এইরূপ দুরবস্থা ছিল। এই জন্য সেক্‌স্‌পীয়ার সুধী-মণ্ডলী মধ্যে স্থান পান নাই।

তাহার উপর, যাহারা নট, তাহাদের সমাজে একেবারেই প্রতিষ্ঠা ছিল না। এটা যে শুধু ইংলণ্ডের কথা তাহা নহে। অন্যান্য দেশেও নটের ব্যবসায় সমাজে নিন্দনীয় ছিল। ভারতবর্ষে অভিনয় কার্য্য সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাতির দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কেহ ব্যবসায়রূপে নটের কার্য্য গ্রহণ করিলে, উচ্চশ্রেণীর লোক হইলেও, লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত। এই সকল কারণে সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাদির অভিনয়ও বিলাতের সমাজে গুণানুযায়ী আদর প্রাপ্ত হয় নাই।

নাটকাদির অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও অভিজাতবর্গ হৃদয়ের আনন্দ সম্যক্ প্রকাশে লজ্জাবোধ করিতেন। অভিনেতৃগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশার্থেই যেন তাঁহারা অভিনয় দেখিতেন।

এই জন্য নাট্যকলা মনোমুগ্ধকারী শক্তি লইয়াও সেক্‌স্‌পীয়ারের প্রাদুর্ভাবকালে আশানুরূপ প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না। অভিনেতৃবর্গের উপর ঘৃণার কিয়দংশ নাটককারের উপর পড়িল। ডাক্তার

ইঙ্গলণ্ডী নাটককার লজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যদিও লজ কখনও রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন নাই, তথাপি অভিনয়ার্থ নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও ঘৃণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।" সেক্স্‌পীয়ার নাট্যকার ও অভিনেতা। এই অপরাধে মহাকবি দেশবাসিগণের নিকটে একরূপ অপরিজ্ঞাতই রহিয়া গেলেন। সেক্স্‌পীয়রের মৃত্যুর পর কিছুদিন অভিনয়ের আদর ক্রমশঃই কমিতে লাগিল। অবশেষে ক্রম্‌ওয়েলের সময় রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবাদীগণের উদ্ভবে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে রঙ্গালয় কিছু দিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। মহাকবির সময়ের তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকাদির অপূর্ব্ব অভিনয় স্মৃতি দেশবাসীর মন হইতে একরূপ মুছিয়া গেল।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু তখন তাহার অবস্থা অতি হীন। ভাষা, অলঙ্কার সৌন্দর্য্যে আপনার স্বরূপ ঢাকিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিল, অভিনয়ও সেইরূপ সুরের আবরণে আপনার স্বাভাবিকতা আবৃত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বের কৃষ্ণযাত্রায় চরিত্রাভিনয়ের আবৃত্তি যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই একথা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। এখনও পর্য্যন্ত মজলিসে অনেকেই সেই সকল অভিনয় লইয়া রহস্য করিয়া থাকেন।

ক্রমে এরূপ হইল যে—অভিনয় দ্বারা সু-সমীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মহাকবির নাটকের ভাষা অভিনয়ের জন্য পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি ও বিলাতের লর্ড সভার অন্যতম নেতা লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউনের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এই সকল নাটক পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। গ্যারিকের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলাতের রঙ্গালয়ে যুগানুযায়ী রচিত বহু নাটকের সঙ্গে সেক্স্‌পীয়ারের

এই সকল পরিবর্ত্তিত নাটক অভিনীত হইতেছিল। এই ভাবে অভিনয় কার্য্য চলিতে থাকিলে সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলির কি অবস্থা হইত, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু এরূপ দুর্ভাগ্য ইংলণ্ডকে বহু দিন ভুগিতে হয় নাই। রঙ্গালয়ে এক প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাবে দেশবাসীর মোহ টুটিয়া গেল। বহু দিনের ঘন সঞ্চিত মেঘরাশি এক জনের বাণীস্পন্দিত সমীরণে মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। তখন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বলতায় উচ্ছ্বসিত মহাকবির প্রকৃত মূর্ত্তি ইংলণ্ডবাসী দেখিতে পাইল।

গ্যারিকের পূর্ব্বে একজন সুদক্ষ অভিনেতা সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক চরিত্রের ও তাহার ভাষার অপরিবর্ত্তনীয়তার আভাস প্রদান করেন। উক্ত অভিনেতার নাম ম্যাকলিন। মহাকবির জন্মের প্রায় একশত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৎকৃত সাইলকের অভিনয় দেখিয়া লোকে বুঁঝিল, ভাষার পরিবর্ত্তনে ও তজ্জনিত অস্বাভাবিক অভিনয়ে এতকাল কেবল সেক্‌স্‌পীয়রের বধ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। লোকে বুঝিল, অন্যান্য চরিত্রগুলি এইরূপ অভিনীত হইলে সেক্‌স্‌পীয়র পুনরুজ্জীবিত হইতে পারেন।

লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন সেক্‌স্‌পীয়রের অন্যান্য নাটকের ন্যায় "মারচেন্ট্‌ অব ভিনিস" নাটক খানিও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পরিবর্ত্তিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া একরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। একটী প্রতিষ্ঠিত প্রথার পরিবর্ত্তন যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা ম্যাকলিনের এই সাইলক-চরিত্রের অভিনয়-কাহিনী হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

মানবতার নাট্যকার।

(৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন)

সেক্‌স্‌পীয়র মানবতার কবি,—তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।

মানবতা কি? এই প্রশ্নের আমরা এইরূপ উত্তর পাইয়াছি। মানবতা দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়, মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তকের প্রকাণ্ড সমষ্টি। এই মানবতার বিরাট চিত্র সেকস্‌পীয়রের কল্পনাদর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি মানবতার কবি।

এ কথা আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি এ কথাটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেকৃসপীয়র যদি মানবতার কবি হয়েন, তবে তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনা-শক্তি। এই সিদ্ধান্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সেকৃস্‌পীয়রের নাটকাবলীর আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, চরিত্র চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বোধ হয়, জগতের কোন কবিই এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। চরিত্রাঙ্কনেই তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেকস্‌পীয়র কি ভাবে মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?

সেকৃস্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, প্রথমতঃ চমৎকৃত হইতে হয় তাঁহাদের সুসম্পূর্ণতায়। যেন তাঁহার এই সৃষ্টি বিধিসৃষ্টির সমব্যাপক। কোন অংশ বিকৃত অপর্য্যাপ্ত অঙ্গহীন নহে। মানবতার পূর্ণ প্রতিকৃতি—মানুষের দেবত্ব ও পশুত্ব, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব, তাহার নীচতা ও উদারতা, তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও অবসাদময় নৈরাশ্য, সর্ব্বোৎসর্গী আত্মত্যাগ ও আত্মম্ভরী স্বার্থপরতা, বিশ্ববিজয়ী প্রেম ও মোহান্ধ ইন্দ্রিয়পরতা, উন্মুক্ত সরলতা ও সংমোহন কাপট্য—

সকলই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের কোন অংশ বাদ দেওয়া তিনি সঙ্গত ভাবেন নাই। সেই জন্য মানুষকে সকল অবস্থাতেই চিত্রিত করিয়াছেন—মানবের উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ভাল মন্দ, সকল বৃত্তিরই ছবি ফুটাইয়াছেন। * তাঁহার চক্ষে কোনটিই পরিত্যাগের যোগ্য নহে। এমন কি যে সকল বৃত্তি মানসিক ব্যাধি, দুর্ব্বলতা অথবা ব্যামোহের ফল, সেগুলিও সমান দক্ষতায় সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকেই চরিত্রাঙ্কনের সুসম্পূর্ণতা বলিতেছি।

আর চরিত্র-চিত্র সুসম্পূর্ণ বলিয়াই কোথাও সত্যের অপলাপ হয় নাই। এমন যথাযথ চিত্রণ অন্য কবির কাব্যে দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেকসপীয়র তাহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথাও অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। তাঁহার লক্ষ্য স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন নহে। † দর্পণে যেমন মুখের অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাঁহার নাটকে সেইরূপ মানব-প্রকৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। মনুষ্য-জীবনের কোন ব্যাপারই, কোন ঘটনাই, ছাঁটিয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। জীবনে ঠিক যেমন ভাব ঘটে, ভাল হউক মন্দ হউক, শ্লীল হউক অশ্লীল হউক, উচ্চ হউক নীচ হউক, সেই ভাবেই তাঁহার নাটকে চিত্রিত দেখি। অতএব তাঁহার চরিত্রচিত্রণ যে সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

---

* He finds in man nothing that he would care to lop off. He accepts nature & finds it beautiful in its entirety. He paints it in its littlenesses its deformities, weaknesses, its excesses its irregularities & in its rages. He exhibits man at his meals, in bed, at play, drunk mad, and sick.

Taine's English Literature, Vol I. Shakespeare.

† He sees things as they are with their ugly & beautiful details by imitative sympathy.

আর যথাযথ বলিয়াই সে চিত্র সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। চরিত্রের অসঙ্গতি অমিল অস্বাভাবিকতা, সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে কোথাও লক্ষিত হয় না। যাহার মুখে যে কথা সাজে না, সেকস্‌পীয়ার কখন তাহাকে সে কথা বলান না। যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভবে না, সেকস্‌পীয়ার কখন তাহাকে সে কার্য্য করান না। প্রত্যেক চরিত্রের যাহা বীজশক্তি—যে শক্তির বশে প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চেষ্টা নিয়মিত হয়, কল্পনা ধ্যান দ্বারা সেকস্‌পীয়ার সেই শক্তির ধারণা করিয়া লয়েন, এবং তাহা হইতে প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য, প্রতি চেষ্টার কার্য্য-কারণ-ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল বাস্তব নরনারীর ন্যায় সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। কবি মধুসূদন বীররসের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের মুখে—

> 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে;
> যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু * * *
> মূর্খ যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।'

ইত্যাদি বাক্য বসাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ব্রীড়াময়ী জানকীকে পরপুরুষের প্রেম-ভিক্ষার্থিনী শূর্পণখার লজ্জাহীনতায় হাসাইয়াছেন। সেকস্‌পীয়ারে আমরা কখন এরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাইব না। যে যেমনটি, সেকস্‌পীয়র তাহাকে ঠিক সেই মত কথা বলান, সেইমত কার্য্য করান, সেইমত চেষ্টায় নিযুক্ত করেন। সেকস্‌পীয়রের নাটকে যে সকল অশ্লীলতা গ্রাম্যতা অশিষ্টতার সমাবেশ দেখিতে

---

* Numbers of the errors of taste in Shakespeare have turned out to be striking touches of character ; the esthetic deformities imputed to his poetry have proved the moral deformities of certain of his persons ; and what had been denounced as a fault was found to be an excellance—

Gervinus.

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক জারভাইনস এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'লোকে পাই, বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সমস্তই চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষার নিমিত্ত।
যাহাকে রুচিভঙ্গের উদাহরণ ভাবিত, অধুনা তদ্দ্বারাই সেকস্‌পীয়ারের চরিত্র-চিত্রণের অদ্ভুত কারিগরি সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহা তাঁহার কাব্যের অঙ্গবিকৃতি বিবেচিত হইত, তাহাই তৎসৃষ্ট চরিত্রবিশেষের সুসঙ্গত নৈতিক বিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। আর যাহা দোষ বলিয়া নিন্দিত হইত, তাহা সম্প্রতি গুণে পরিণত হইয়াছে।'

সেকস্‌পীয়ার-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আর একটি বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র। জগতের কোন কবিই বোধ হয় এত প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতা নাই। কালিদাসের দুষ্মন্ত, পুরুরবা, অগ্নিমিত্র, একই ধরণের নায়ক। মিলটনের সয়তানে যে সুর, স্যাম্পসনে তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরণের ম্যানফ্রেড, করসেয়ার, লারা, জিয়র, একই ধাতুর লোক। অথচ সেকস্‌পীয়ার শত শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সকলেরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। এ বিষয়ে সেকস্‌পীয়রের কতটা কৃতিত্ব, *মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞান, তাহার উত্তম প্রমাণ পাই 'কিং লিয়রে'। যাঁহারা সেকস্‌পীয়রের এই মহানাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, একই প্রকৃতি ও অবস্থাপন্ন লিয়র ও গ্লষ্টরকে তিনি কেমন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; একই প্রলয়করী বিনাশ-

* There is no repetition among them; though there are some striking family resemblances, yet no two of them are individually alike.

Hudson vol. I 167.

শক্তির আধার গণারিল ও রিগণ ভগিনীদ্বয়কে কেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন ; আর একই পিতৃপ্রেমের অবতার করডিলিয়া ও এডগারকে সমান ভাবে নির্য্যাতনগ্রস্থ করিয়াও কেমন বিচিত্রভাবে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যায়। অন্য কবিরা স্বজাতীয় চরিত্রকে সমান করেন ; সেকস্‌পীয়র একাধারে সমজাতীয়তা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেন। মারকিন সমালচক হাড্‌সন্‌ যথার্থ বলিয়াছেন,—'সেক্‌স্‌পীয়রের চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। স্বজাতীয় চরিত্রের মধ্যে সমানতা আছে বটে ; কিন্তু কোন দুইটি চরিত্রই অস্বতন্ত্র নহে। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে।'

ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণ-বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তগত ভাব-সমূহের অঙ্কন-বিষয়েও ঐ কথাই বলা যায়। একই ভাব—প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রভেদ তিনি এমন দক্ষতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে প্রদর্শিত করিয়াছেন, যে তাহার আলোচনায় বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। দেসদিমোনার প্রতি ওথেলোর অবিশ্বাস, ইমোজেনের প্রতি পসথুমাসের অবিশ্বাস, এবং হারমিয়োনির প্রতি লিয়নটিসের অবিশ্বাস—এ তিনে কত প্রভেদ! ম্যাকবেথের লোভ, তৃতীয় রিচার্ডের লোভ, ইয়াগোর লোভ কত বিভিন্ন! রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, ফার্ডিনন্দ মিরান্দার প্রণয়, ফ্লোরিজেল পরদিতার প্রণয়, এবং ব্রুটস পোরসিয়ার প্রণয় এক হইয়াও কত অন্য। এইরূপ অন্যান্য বৃত্তির সম্বন্ধেও দেখা যায়।

কোন একটি চিত্র তুলিয়া ফুটাইতে হইলে, প্রথমে তাহার বিষয় হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে হয়। তবে সেই চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। সেকসপীয়রের চিত্রফলকে আমরা যেরূপ উদ্ভাসিত চিত্রসমূহের সাক্ষাৎ পাই, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সেই বিবিধ চিত্রের প্রতিরূপ হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহার চিত্তে এত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভাবে, নিরুদ্বেগে একত্র বসতি করিতে পারিত, তাঁহার কি বিপুল

অপক্ষপাতিতা! কি অপরিসীম উদারতা! (The perfect even handedness of Shakespeare's representations) 'কেলিবন ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম ও থিসিয়ুস এবং প্রসপেরো; পেরোলিস ও হটসপার এবং পঞ্চম হেনেরি; ডোল টিয়ারসিট ও ইসাবেলা; মিসেস কুইকলি ও ভলামনিয়া;—সকলই এক কল্পনাপ্রসূত'। * সর্ব্বত্র সমান আত্মীয়তা, সমান ধীর স্থির প্রশান্ত ভাব! কেহই তাঁহার সহানুভূতির সীমার বহির্ভূত নহে। এডমণ্ড ও ইয়াগোও বোধ হয় নহে। আর্য্যঋষিরা যাহাকে উপেক্ষা বলিতেন, ইংরাজীতে Tolerance শব্দে তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া যায়, মহাকবি সেকসপীয়রের তাহা স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সেই জন্য যাহাকে নৈতিক কঠোরতা—অসহিষ্ণুতা বলে, সেকসপীয়রে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ সমালোচক হ্যাজলিট্ † ঠিকই বলিয়াছেন,—'লেখকদিগের মধ্যে সেকসপীয়র সর্ব্বাপেক্ষা কমনীতিশালী। কারণ, যাহাকে নৈতিকতা বলা যায়, তাহা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা মানব প্রকৃতির সহিত সর্ব্বত্র সহানুভূতিযুক্ত—উচ্চ নীচ উত্তম অধম সকল অবস্থায় সহিষ্ণু।' সেক্‌সপীয়র জানিতেন যে, কেহই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা মন্দ নহে। সকলেরই দোষ গুণ, উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন;—

The web of our life is of a mingled yarn; our virtues

* With all natures he is kin. From Caliban to Titania Miranda; from Bottom to Theseus Prospero; from Parolles to Hotsper and Henry; Doll Tearsheet to Isabella; Mrs. Quickley to Volumnia, he ranges with equal power at will—Furnival.

† Shakespeare was the least moral of all writers for morality only so called is made up of antipathies; and his talent consisted in sympathy with human nature in all its shapes degrees, elevated depressions :— Hazlitt, English stages.

would be proud if our vices whipped them not; and our faults would despair if they were not cherished by our virtues. আমাদের জীবনপট বিমিশ্রসূত্রগ্রথিত। আমাদের গুণভাগ দোষাহত বলিয়াই গর্ব্বান্ধ হইতে পায় না। আমাদের দোষভাগও গুণপুষ্ট বলিয়াই নিরাশায় বশবর্ত্তী হয় না।

সেই জন্য সেক্‌সপীয়র অতি বড় পাপিষ্ঠের প্রকৃতিতেও একটুকু সদ্‌-গুণের সৌরভ মিশাইয়াছেন। তাঁহার ইয়াগো ফলসট্যাফ্ ক্লিওপেটরা দানব দানবী নহে—একবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নহে। তাঁহার হ্যামলেট প্রসপেরো ইমোজন নিখুঁত দেবত্বের অবতার নহে,—সম্পূর্ণ মানবতার অতীত নহে। অধিকাংশ কবির অবলম্বিত প্রণালী ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা হয় দেবের, না হয় দানবের সৃষ্টি করেন। নরনারী গড়িতে পারেন না।

সেক্‌সপীয়রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মারলোর সৃষ্ট ব্যারাবাস বা ট্যামারলেন নিরবচ্ছিন্ন দানব। অন্য দিকে রিচার্ডসন প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট পেমিলা বা গ্রাণ্ডিসন সম্পূর্ণতঃ দেব; ইহাদিগের মধ্যে কেহই মানুষ নহে। দেবত্ব ও পশুত্বের যে দৈব রসায়নিক সংযোগে মনুষ্যত্ব—সে মনুষ্যত্ব এ সকল চরিত্রে নাই। সেই জন্য ইহাদিগকে অস্বাভাবিক অপ্রকৃত মনে হয়। ইহারা যেন মাটীর প্রতিমা, অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি। রক্তমাংসে গঠিতদেহ মানুষ মানুষী নহে। এক কথায় ইহারা নির্জ্জীব।

সেক্‌সপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের এক অদ্বিতীয় লক্ষণ, তাহাদের সজীবতা; তাহারা প্রাণময় জীবন্ত নরনারী; মাটীর প্রতিমা বা প্রস্তর মূর্ত্তি নহে। তাহারা এতই সজীব যে, মনে হয় যেন তাহাদের শরীর বিদ্ধ করিলে রক্ত পাত হইবে। * অন্য কবিরা কোন একটি ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে মানুষের

---

* 'If you prick them, they well bleed'

It would see in man not a general passion—ambition anger or love; not a pure quality happinessavarice folly, but a character—Taine.

মুখস পরাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করান; প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বাস্তব নরনারী নহে; নরনারীর ছবিমাত্র। অর্থাৎ, ঐ সকল চরিত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষা বা প্রতিহিংসার আকার মূর্ত্তি—সজীব প্রাণশালী মানুষ নহে। মারলো কবির 'ব্যারাবাস' সুধুই লোভের উপাদানে গঠিত; তাহার প্রকৃতিতে অন্য মনুষ্যবৃত্তি নাই। তাঁহার টেমারলেন নিরবচ্ছিন্ন দুরাকাঙ্ক্ষীর অবতার; তাহার নির্ম্মাণে অন্য মাটির সমাবেশ নাই। বেন জনসনের বোবাডিল কেবল দেহধারী মূঢ়তা; তাহার গঠনে অন্য দোষ গুণ নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে ঐ জাতীয় যে সকল চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাহাদের তুলনায় ইহারা কৃত্রিম মানুষ, রক্তমাংসগঠিত নহে। সাইলক ও ব্যারাবাসে কত প্রভেদ! ক্লোটন ও বোবাডিলে কত অন্তর! ট্যামারলেন ও তৃতীয় রিচার্ডে কত ব্যবধান। একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। সেক্‌স্‌পীয়ার চরিত্রের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। মারলো প্রভৃতি কবির প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করেন না; বাহ্য আকার মানুষের মত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্র অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট নহে। তাহাদের ভিতর খড় মাটি বা ভূষিতে পূর্ণ, এবং বাহিরটা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত। এক কথায় সেক্‌স্‌পীয়র চিরিত্রের মূলতত্ত্ব—বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য কবির অবলম্বন একটি অস্থায়ী ভাব, চেষ্টা, বা চিত্তবৃত্তি। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সেক্‌স্‌পীয়রসৃষ্ট চরিত্রে একটা বিপুলতা, একটা বিচিত্রতা, একটা হ্রাস বৃদ্ধি জোয়ার ভাঁটার ভাব আছে। তাহারা স্থিতিশীল, অথচ পরিণামী। তাহারা স্থির, অথচ চলিষ্ণু। তাহাদের পরিচয়ে মনে হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা ভূত

ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি আছে। তাহারা বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে। †

সেকস্‌পীয়র স্বষ্ট চরিত্রের সজীবতা একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, জীবন্ত নরনারীর ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন চরিতাখ্যায়ক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি নরদেব; কাহারও মতে তিনি শোণিতলোলুপ পিশাচ; আর কাহারও মতে তিনি ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয়। এরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, সমগ্র নেপোলিয়নকে আমরা কেহই দেখিতে পাই না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও শিক্ষা অনুসারে এক জন এক দেশ, অপর জন অন্য দেশ দেখি। সেইজন্য দর্শকের মধ্যে এত মতভেদ হয়। সেকৃস্‌পীয়রস্বষ্ট চরিত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। এক হ্যামলেটের চরিত্র ধরুন। কোন সমালোচকের মত,—তিনি দারুণ পাষণ্ড। কেহ বা তাঁহাকে দেবত্বের এক রতি হ্রাস ভাবেন। কাহারও বিবেচনায় তিনি প্রতিকূল ঘটনাস্রোতে ভাসমান, ইচ্ছাশক্তিহীন, তুর্ব্বল তৃণ। আর কেহ বা তাঁহাকে পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তির অবতার বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ মতভেদের একমাত্র কারণ, হ্যামলেট চরিত্রের সজীবতা। অন্য কবির রচিত চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ হয় না। ব্যারাবাসকে সকলেই একবাক্যে সঞ্চয়স্পৃহার প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। বোবাডিলে সকলেই মূঢ়তার চিত্র অঙ্কিত দেখেন। মোটারলেনে সকলেই তুরাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ দেখিতে পান। জগতের নরনারীর ন্যায় সেকস্‌পীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই জটিল—কয়েকটি চরিত্র একবারেই গহন। হ্যামলেট ক্লিয়োপেটরা ফলষ্ট্যাফ্‌ প্রভৃতির রহস্যোদ্ভেদ অতীব

† There is a certain vital limberness and ductility in them. Thus they have to our minds a past & a present and even in what we see of them at any give moment there is involed some thing both of history and prophecy.—Hudson.

দুঃসাধ্য। এরূপ বুঝিবেন না যে, সেকস্‌পীয়রের কোন চরিত্রেরই তথ্য নির্ণয় করা যায় না। জগতে যেমন অনেক নরনারীর চরিত্রবৃত্তান্ত তাহাদের বদনে অঙ্কিত থাকে, যে দেখে সেই বুঝিতে পারে; সেকস্‌পীয়রেও সেইরূপ নরনারীর অসদ্ভাব নাই। আবার জগতে যেমন অনেক মনুষ্য আছে, যাহাদের জীবনসমস্যার নির্ণয় করা অতি সুকঠিন ব্যাপার; সেকস্‌পীয়র সেইরূপ আছে। এরূপ থাকিবার কারণ, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতা।

সেক্‌স্‌পীয়র কি ভাবে মানবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহা কতকাংশের পরিচয় পাইলাম। আমরা দেখিলাম (১) তাঁহার চিত্র সুসম্পূর্ণ; বিকৃত, অপর্য্যাপ্ত, বা অঙ্গহীন নহে। (২) তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ সত্যনিষ্ঠ, যথাযথ। (৩) এবং সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক। (৪) তাঁহার সৃষ্ট চিত্রাবলী বিবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ (৫) এবং তাহার চিত্রণে আমরা মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞানের পরিচয় পাই। (৬) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদার অপক্ষপাতিতা এবং অপরিসীম উপেক্ষাভাবে বিস্মিত হইতে হয়। (৭) এবং ধারণা হয় যে, তাঁহাতে অসহিষ্ণুতা বা নৈতিক কঠোরতার লেশমাত্র নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমান সহানুভূতিশালী। (৮) তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রাণময় জীবন্ত নরনারী, এক কথায় তাহারা সজীব মনুষ্য। (৯) তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর ভিত্তিস্থাপন করেন—চরিত্রের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। (১০) সেজন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা একটা বিপুলতা এক হ্রাসবৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা বর্ত্তমানে সীমান্বিত নহে; তাহাদের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভাবী পরিসমাপ্তি আছে।

সেক্‌স্‌পীয়র কৃত চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে উপরে যে সকল সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার যথার্থ্যতা অনুভব করিবার জন্য তাঁহার নাটকাবলীর

পুনঃ পুনঃ আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিলে ঐ সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে।

নাট্য-সাহিত্যে নবীনচন্দ্র

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম যখন "পলাশীর যুদ্ধ" পড়ি তখন বোধ হয় দৃষ্টি আর এক রূপ ছিল—মন স্বতন্ত্র প্রণালীতে ধাবিত হইত—হৃদয়-তন্ত্রী ভিন্ন ছন্দে ধ্বনিত হইত। এখন নয়নে সে মদিরা না থাকিলেও- মনের সে উদ্দাম গতি রুদ্ধ হইলেও—হৃদয়ে সে স্ফূর্ত্তি আর না আসিলেও— "পলাশীর যুদ্ধের" মোহনলালের উক্তি আবৃত্তি করিয়া আজিও যেন প্রথম যৌবনের সেই বুকভরা উল্লাস, প্রাণ পোরা উৎসাহ, মন মাতান উত্তেজনা অনুভব করি। ঐ অপরূপকাব্য লিখিত হইবার পর যে ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বনে উহা বিরচিত, তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা অনেকাংশে অমূলক। কিন্তু উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি দৃঢ় হউক আর নাই হউক, উহার কাব্যাংশের যাহা প্রাণ—তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়িয়া আমার ধারণা হয় যে কবি বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয় ভাব জাগরিত করিবার জন্যই ঐ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে মহৎ উদ্দেশ্য ঐ কাব্যের দ্বারা যেরূপ সাধিত হইয়াছে, বোধ করি আর দুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন বঙ্গভাষায় অপর কোন পুস্তকের দ্বারাই তেমন হয় নাই। তিনি তাঁহার আদরের মাতৃভূমির জন্য যে ভাবনা করিয়াছিলেন—যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন—"পলাশীর যুদ্ধের" প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহা

অনুভব করাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে সমগ্র বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরঋণী।

নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর তুইটি দিক আছে। একদিক—তাঁহার জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের অরুণরাগে উদ্ভাসিত—আর একদিক তাঁহার সমগ্র মানবজাতির প্রতি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রীতির আলোকে আলোকিত। তাঁহার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' সেই বিশ্বপ্রেম গাথারই তিনটী অমৃতময়ী ধারা। সেই মহাপ্রেমের মধুর নিকণেই তাঁহার 'অমিতাভ' ও 'খৃষ্ট' চিরমুখরিত। এমন অবিশ্রান্ত সুধার ধারা বুঝি বা অতি অল্প কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহারই 'শৈলজা'র মুখে তাঁহার আদর্শ-পুরুষ—তাঁহার বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই কাতর নিবেদন শুনিতে পাই :—

"জগন্নাথ জগৎপতে! আর্য্য অ.:র্য্যের হরি!
হে নীলমাধব! দাও পদাম্বুজ দয়া করি।"

তাই ভক্তি নম্র হৃদয়ে—আমি নবীনচন্দ্রের রচনার চির অনুরাগী। গ্রন্থপাঠে যাঁহার প্রতি এই অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তাঁহার দর্শনেও মহাপুণ্য। ভাগ্যবান আমি—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই সহৃদয় মহাত্মার শুধু দর্শনলাভ নহে—তাঁহার কোমল উদার স্নেহের কণিকামাত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। বিশ্বপ্রেমে যাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ—তাঁহার স্নেহের সীমা নাই, আদি নাই—অন্ত নাই। দানে তিনি অমিতহস্ত। স্নেহধারে তিনি আমায় সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে সে স্নেহসুখে বঞ্চিত হইব, তাহা ভাবি নাই। কালের ক্রোড়ে ক্রীড়মান জীব আমরা—মুহূর্ত্তে যবনিকার অন্তরালে গিয়া পড়ি। যে যায়—আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ সম্বন্ধে এ নিয়ম

খাটে না। কাল সকলই লয় করে, কিন্তু মহাপুরুষের নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে না! মহাপুরুষের মৃত্যুর অর্থ—মহাজীবনের সূচনা। দয়াবতার হাওয়ার্ড, বীরশ্রেষ্ঠ গর্ডন, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্ম, মহর্ষি বাল্মিকী, ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব, সাধক প্রধান রামকৃষ্ণ—সকলেই কালজয়ী মহাপুরুষ। তাঁহাদের মৃত্যু নাই—তাঁহারা অজর অমর। আগ্নেয় অক্ষরে অনন্তকাল তাঁহাদের নাম জগতবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। নবীনচন্দ্রের রচনার মধ্যে নবীনচন্দ্র জীবিত—তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে তিনি সদাই প্রস্ফুটিত—মরিয়া তিনি অনন্তজীবন লাভ করিয়াছেন।

কবিবরের সহিত আমার বহুদিন বহুবিষয় লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি বহুগবেষণাপূর্ণ কবিত্বময় পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সমাজ-ধর্ম্ম-শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-নাটক ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে আলোচনা ছিল। মূল্যবান পত্র বলিয়া আমি তৎসমুদয় সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। প্রথম যখন আমার নাট্যজীবন আরম্ভ হয়, তখন চারিদিক হইতে বাধা ও বিপত্তির স্রোতে—আমাকে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু পরলোকগত—সোদরপ্রতিম—স্বর্গীয় কবিবর আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই—মহামন্ত্রের ন্যায় আমাকে নবজীবনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

প্রথম কি সূত্রে কবিবরের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং কি জন্য আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব। সে আজ বহুদিনের কথা। আমি তখন বিংশ বর্ষীয় যুবক। নাট্যশিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ, নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধনে সকলেই উদাসীন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক করিয়া লইলাম। গতিপথে অনেক

বাধা, অনেক বিঘ্ন; অনেক প্রতিবাদ, অনেক গঞ্জনা আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু চিরপোষিত কর্ত্তব্য হইতে কিছুতেই বিচলিত হই নাই। নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া—গিরিশ বাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবিবরের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি 'সিরাজের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া—রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া—আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ান্তে যখন ঐক্যতান বাদন হইতেছিল,—এমন সময় দেখিলাম পূজ্যপাদ গিরিশ বাবু এক শান্ত সুন্দর সৌম্য পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। অনিমেষে সেই অনিন্দসুন্দর—প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি আগন্তুকের পানে ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তর মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সেই নবাগত—নবীন অপরিচিতের চরণপ্রান্তে প্রণত হইবার জন্য মস্তক নত হইয়া পড়িল। গিরিশ বাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন,—"অমর, কে আসিয়াছেন—বল দেখি?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশ বাবু কহিলেন,—"ইনিই কবি নবীনচন্দ্র!"

"পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা নবীনচন্দ্র—আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম, তখনও 'পলাশীর যুদ্ধের', সিরাজের ভূমিকার সকল কথাই কাণে বাজিতেছিল—তখনও কবির রসময়ী লেখনী-ভঙ্গে অন্তরে বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল—তখনও দর্শকবৃন্দের পুলকপুরিত করতালি-ধ্বনি রঙ্গালয় মুখরিত করিতেছিল—এই সকলের মধ্যে গিরিশ বাবুর গুরুগম্ভীর বাণী—আমার প্রাণে

এক অপূর্ব্ব আবেশ আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার কোমলহস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে আমায় উঠাইলেন—মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের রত্নলাভের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সামগ্রী আমি লাভ করিলাম। কবিবরের অকৃত্রিম স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম। তিনি আমায় অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্ম-প্রশংসা করা হয়। আত্মপ্রশংসা—গুরুতর মহাপাপ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া গিরিশবাবুর সঙ্গে আমি কবিবরের বাটীতে গমন করি। তিনি যেরূপ সরলভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমি প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' যাঁহার সৃষ্টি—তাঁহার মুখে শিশুর সরলতা—তাঁহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। আমাদের সহিত কত কথাই কহিলেন। অনিমিষে আমি তাঁহার সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রসঙ্গক্রমে 'পলাশীর যুদ্ধের' কথা উত্থাপিত হওয়ায় গিরিশ বাবু কবিবরকে "ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার!" এই পংক্তিটি সম্বন্ধে বলিলেন যে "উহা Lord Byron এর Child Harold এর 3rd canto এর 22nd stanza * হইতে অনুকৃত। Byron Waterloo যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রের বর্ণনা করিয়াছেন;—আর উক্ত পংক্তিটী পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে"। এই কথা বলিয়া গিরিশ বাবু নবীন বাবুকে জানাইলেন যে "আমার বিবেচনায় অনুবাদটী তেমন পরিস্ফুট হয় নাই"। গিরিশ বাবুর কথা শুনিয়া কবিবর তাঁহাকে বলিলেন,—

* And nearer, clearer, deadlier than before!
Arm! Arm! it is—it is the canon's opening roar!

"আপনি হইলে ইহার কিরূপ অনুবাদ করিতেন ?" গিরিশ বাবু চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

"নিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জ্জন,
যে যেখানে অস্ত্র ধর কামান ভীষণ !"

উদার কবি নতশিরে অনুবাদকের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নিজের লেখার প্রতিবাদ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

কবিবরের এই সহৃদয়তাদর্শনে আমি বিস্মিত ও মোহিত হইলাম।

নবীনচন্দ্রের সরলতা, সহৃদয়তা ও উদরতার তুলনা ছিল না। সরলতা ও সহৃদয়তাই জগতের প্রাণ। তাই একটী সরল উদার সহৃদয় প্রাণ চলিয়া গেলে স্বতঃই যেন মনে হয় যে পৃথিবীটা বুঝি প্রাণশূন্য হইয়াছে! স্বর্গীয় মহাত্মার তিরোধানে আমরাও তাই চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি! *

* বাঙ্গলা নাট্যশালার অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের এই অভিব্যক্তি—কবির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তৎকালের যে-কোন কবি সাহিত্যিক বা সাংবাদিক অমরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, কেহই তাঁহার শ্রদ্ধালাভে বঞ্চিত হন নাই। ইহা ছিল তাঁহার চরিত্রগত অন্যতম বৈশিষ্ট্য।—সম্পাদক।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

হাতের কাজ যখন শেষ হয় তখন সেই কাজের শ্রম ভুলিয়া মনকে আনন্দ দিতে মানুষ খোঁজে উপাদান। অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা থাকিলে শরীর বাঁচিতে পারে, কিন্তু এই আনন্দবিহনে মানুষের মন মরিয়া যায়। খেলাধূলা বা শিল্পচর্চ্চার মত নাটক দেখাও চিত্তবিনোদনের জন্য।

নাটক দেখিতে আসিয়া দর্শক খোঁজে গল্প, খোঁজে তাহাদের জীবন। ঘাতপ্রতিঘাতে চঞ্চল পারিপার্শ্বিকতার সহিত মানবাত্মার নিষ্ঠুর সংগ্রাম যে নাটকে যত বেশী, সাফল্য গৌরবে তাহা ততই সার্থক। আবার এই জীবন সংগ্রাম একটানা বর্ণিত হইয়া চলিলে দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক বলিয়া নাটকে হাল্কাধরণের হাস্যরসের সন্নিবেশ করা হয়, ইহাতে ভারাক্রান্ত মন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায়, নাটকের একঘেয়ে ভাব কাটিয়া গিয়া অভিনয় আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে।

আসল কথা নাটক শুধু ভাবধর্ম্মী হইলে চলে না ইহাতে বস্তুর একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট স্থান থাকা চাই। জীবনের সুখ দুঃখ, বাসনা বেদনা, বিরহমিলনের সহজ ছবিটি দেখিতে দেখিতে অন্তরালবর্ত্তী নাট্যকারের হস্তক্ষেপে বাহিরের দৃশ্য যখন মনের দুয়ারে হানা দিয়া আমাদের আকুল করিয়া তোলে, মিলনের আনন্দ বা বিরহের বেদনা রসবোধের সংকীর্ণ পথে আসিয়া যখন রঙ্গমঞ্চকে গৃহ মনে করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে—তখনই নাটক রচনার সফলতা প্রমাণিত হয়।

ইউরোপে ও ভারতবর্ষে নাটক রচনার সূত্রপাত হয় আনন্দ পরিবেশনের শুভসংকল্প হইতে। কথিত আছে, দেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য ভরতমুনি নাট্যসাধনা করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশেও আদিযুগে ধর্ম্মের ভিত্তিতে নাটক রচনা পুণ্যকাজ বলিয়া মনে করা হইত।

ইউরোপে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে বহুদিন খ্রীষ্টের ও তাঁহার সঙ্গীদের জীবনকাহিনী খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হইবার পর নাটক রচনা এবং অভিনয়ের ভার জনসাধারণের হাতে আসে এবং তখনই নাটকে হাস্যরস স্থান পাইতে সুরু করে। যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী এতকাল নাটকের একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হইতেছিল যোড়শ শতাব্দীতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্যের গৌরবময় আদিযুগ যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে গেলে ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ তখন হইতেই আরম্ভ হইল।

বৈষ্ণবযুগের পর যে দুই শতাব্দী বাংলার সাহিত্যগগণে অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল সেই সময়ে কবিগান, পাঁচালী ও পৌরাণিক ধরণের পালা রচিত হইয়া জনসাধারণকে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিত। বাংলা নাটকের আদিসূত্র খোঁজ করিলে ইহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তারাচাঁদ সিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' বাংলার প্রথম নাটকীয় উদ্যমের নিদর্শন স্বরূপ। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও 'নববাবুবিলাসে' বাংলা নাটকের অতি শৈশবাবস্থা সূচিত হইয়াছে। নাটকীয় সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া বিচার করিলে হয়তো এইসব নাটক আমাদের হতাশ করিবে, কিন্তু বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

এদিক হইতে বলিতে গেলে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সার্থক নাটক রচনা করেন দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে উচ্চ শ্রেণীর নাটকীয় মানসিক বিপ্লবের বর্ণনা আছে। তাহার বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারীই' বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম যাত্রাগানের সম্পর্কহীন রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক নাটকের দিক হইতে দেখিতে গেলে দীনবন্ধু শক্তিমান নাট্যকার ছিলেন। বাহিরের ঘটনা তাহাদের প্রাণাবেগের প্রাচুর্য্যে যে পথে ছুটিয়া চলে, সেইদিকে

অতি স্বাভাবিক অথচ শক্তিমানের ভঙ্গিতে তিনি তাহাদিগকে চালনা করিয়াছেন। 'নীলদর্পন' যদিও প্রচারধর্ম্মী নাটক তবু ইহাতে এবং "সধবার একাদশী' প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য নাটকে বস্তুধর্ম্ম ব্যহত হয় নাই। নাটকের চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে, তাহাদের ব্যক্তিস্বতন্ত্র নাট্যকারের আত্মপ্রকাশের অপচেষ্টায় চাপা পড়ে নাই।

ইহাদের পরই বাংলার নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। বলিতে গেলে সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যরচনার মূলে যেমন পিলি, লাইলি, গ্রীণ ও মারলো রহিয়াছেন এবং সবচেয়ে বড় হইয়া রহিয়াছে গৌরবোজ্জ্বল এলিজাবেথীয় যুগ, গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মূলেও তেমনি রহিয়াছেন মাইকেল ও দীনবন্ধু এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মিলনের (Indo-European Renaissance) শুভ-মুহূর্ত্ত।

গিরিশচন্দ্রের অসুবিধা ছিল বহু, প্রতিভা ছিল অসাধারণ। অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় সংস্পর্শে না আসিয়াই তিনি নাটকরচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বল ছিল ভারতীয় পুরাণ, যাত্রাওয়ালাদের খানকয়েক তৃতীয় শ্রেণীর নাটক, বিখ্যাত দীনবন্ধু, মাইকেল ও অখ্যাত কয়েকজনের বাংলা নাট্যরচনা এবং বহুপ্রশংসিত সেক্‌স্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলী। সুযোগ অল্প ছিল বলিয়া তিনি অধিক পড়িতে পারেন নাই; অর্থের অতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়াই সুরুচির চরম প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যেটুকু তিনি করিয়াছেন আর্থিক লাভক্ষতির দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই তাহাকে করিতে হইয়াছে। দর্শকবৃন্দকে (যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রযুগে জন্মায় নাই) হাতে রখিয়া প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতে হইয়াছে বলিয়া আজকাল গিরিশচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার বলিয়া মনে হয়। গতিশীল ও প্রতীকধর্ম্মী বিংশ শতাব্দীতে তাই গিরিশচন্দ্র আমল পান না।

কিন্তু ইহাই তো তাঁহার ন্যায্য পাওনা নয়। রুচির ধারা হয়তো বাঁকা পথে চোখের আড়ালে চলিয়া গেল, কিন্তু তাই বলিয়া সুন্দরকে সম্বর্দ্ধনা না করিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে? পাউণ্ড, ইলিয়ট বা 'কামিংস'এর যুগে হয়তো শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছেন, পঞ্চমজৰ্জ্জীয় নাটকের ধারা হয়তো এলিজাবেথীয় নাটকের কিছু পরিমাণ স্থানচ্যুতি ঘটাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া লেক কবিগণ বা সেক্স্পিয়ার কি অপাংক্তেয় হইয়া পড়িবেন? বিচার করিবার সময় গিরিশচন্দ্রের যুগকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের চিন্তার সহিত দেখিতে হইবে, গিরিশচন্দ্রের সময়ে বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার চেয়ে বেশী আর কি করিতে পারিতেন?

অনেকে বলেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাকি মনঃসমীক্ষণ তেমন-ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার নাটকে অতিপ্রাকৃত প্রভাব বেশী বলিয়া জীবনে যাহা সচরাচর ঘটে তাহা সেখানে কেমন যেন অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ভাবধারায় মানুষ হইয়া অনেকেই এ অভিযোগ করেন যে অতীত-প্রীতি বিশ্ববিদ্যালয়কে গিরিশচন্দ্র স্মরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই গিরিশচন্দ্র আজও বাংলাদেশে বাঁচিয়া আছেন, নতুবা এতদিন তাঁহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিতে হইত। (would die a natural death)

এ অভিযোগের উত্তরে একটি মাত্র কথা বলাই যথেষ্ট যে গিরিশচন্দ্র মহাযুদ্ধের আগে নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্যিক। জীবনের উত্থান পতনের যে কাহিনী তাঁহার নাটকে আছে তাহা অপ্রচুর নহে, অস্ফুটও নহে, কিন্তু রোমান্টিক কবির স্বপ্ন জড়ানো বলিয়া তাহাতে ভবিষ্যতহীন বর্ত্তমান প্রকাশের অহমিকা নাই। গিরিশচন্দ্র মনে করিতেন তীক্ষ্ণ রসবোধের এবং উচ্চতম কল্পনার জারক রসে যে পরিদৃষ্টমান বাস্তব সত্য কবির সত্য হইয়া রূপায়িত হইল,

তাহাই সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য। এইজন্য গিরিশচন্দ্রের রচনায় বারবার সেক্স্‌পিয়ারের ন্যায় মহাকবির দেখা পাওয়া যায়। প্রিন্টিং মেসিন, গান-পাউডার প্রভৃতি আবিষ্কারের গৌরবের সহিত স্পেন্সার, বেকনের দানধন্য এলিজাবেথীয় যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া সেক্স্‌পিয়ারের স্বাভাবিক দৃষ্টি যেমন উর্দ্ধলোকের পানে ছুটিয়া চলিত, বহুদিনের জড়তার অবসানে প্রতিভার জয়যাত্রার গৌরবে উজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-দেশে গিরিশচন্দ্রও তেমনি রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে সহস্রমুখী জীবন তিনি তাঁহার সাতশতাধিক চরিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নাটকীয় উৎকর্ষগত কোন ফাঁকি বোধ হয় ছিল না। শ্যামানুরাগিণী 'করমেতী বাই' স্ত্রৈণ স্বামীকে নিঃস্বার্থভাবে শ্যামকে চিনাইল, তাহার বৈষ্ণবীরূপ কি সার্থক চিত্রিত নয়? কালিকিঙ্করকে তিনিতো জোর করিয়া সত্যের অহঙ্কারে আচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেন, কিন্তু 'রঙ্গিনী'কে বিজয়িনী হইতে না দিয়া তো তিনি নাটকের স্বাভাবিক গতি ব্যহত করেন নাই। যে দরদ দিয়া 'হুগো' ভালজি'নকে দেখাইয়াছেন, ইবসেন দেখাইয়াছেন 'নোরা'কে, অপদার্থ দুলালের হাতে 'জোতি'কে না তুলিয়া দিবার আনন্দ ও কিশোর'কে পাইয়াও সত্যভ্রষ্ট হইবার ব্যর্থতার দ্বন্দ্বে বিপর্য্যস্ত 'করুণাময়'কে আত্মহত্যা করাইতে কি তাহার চেয়ে কম দরদের প্রয়োজন হইয়াছে? পৌরাণিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র যতদুর সম্ভব আধুনিক হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাত্রাধর্ম্মী দর্শকবৃন্দকে তুষ্ট রাখিয়া এবং তাহাদের পুরাণ-বিশ্বাস আহত না করিয়াও পাণ্ডবগৌরবের 'দুর্ব্বাশা'কে তিনি অশ্বিনী 'উর্ব্বশী'র জন্য খাদ্যসংগ্রহ করাইয়াছেন, ক্রোধই যে তাঁহার জীবনে একমাত্র সত্য নয়, মনের অন্য মধুর দিকগুলি যে তাঁহার একবারে মরিয়া যায় নাই—দুর্ব্বাশা'র এই মহত্ত্ব দেখাইতে গিরিশচন্দ্রের রোমান্টিক ভাব ফুটিয়া উঠিলেও পুরাণের অপূর্ণতাটুকুওতো ভরিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং দেবতাদের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় গিরিশচন্দ্র মাইকেল ও পুরাণাদির মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। অন্ধবিশ্বাসের জোরে অথবা পুরুষার্থপ্রবণতার প্রচারলোভে তিনি মানুষ ও দেবতার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। রাবণ-বধের রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণের মধ্যে যেমন দেবভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, রাবণের মধ্যেও তেমনি মহামানবতার অভাব নাই। এই সামঞ্জস্যসৃষ্টি করিয়া মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে গিরিশচন্দ্র সেতু বাঁধিয়া দিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে সংস্কারের যেটুকু কণ্ঠরোধ গিরিশচন্দ্র চাহিয়াছেন তাহা জনকল্যাণের জন্য। ধ্বংসের জন্য তিনি ধ্বংস চাহেন নাই, চাহিয়াছেন সৃষ্টির জন্য। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত রিয়েলিষ্ট স্কুলের পথদ্রষ্টা ইবসেন ও কবি শেলীর তুলনা করা চলে।

পৌরাণিক 'নাটকে' ভৈরব, ডাকিনী, গঙ্গারক্ষক, রাক্ষস প্রভৃতির আগমন অনেকের কাছে গিরিশচন্দ্রের রুচিহীনতার পরিচায়ক। যাত্রাগানের প্রভাবসম্বন্ধে তাঁহারা যে ইঙ্গিত করেন তাহাতে অবশ্য কিছু সত্য আছে, কিন্তু ইহাদের নাটকে স্থান পাওয়ার কারণও যে নাই এমন নহে। গিরিশচন্দ্রের যুগে, আগেই বলা হইয়াছে, সাধারণ দর্শকবৃন্দ (যাহাদের অর্থে পেশাদার গিরিশচন্দ্রের অন্নসংস্থান হইত) যাত্রা দেখিতে অভ্যস্থ ছিলেন এবং ভৌতিক বিশ্বাস সে যুগে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সামাজিক নাটকে ইহাদের দূরে রাখিলেও মহাদেব বা গঙ্গা আসিলে ভৈরবগণ বা গঙ্গারক্ষকগণকে ঠেকাইয়া রাখা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া স্থুল-রসবোধী দর্শকদের আনন্দ দিতে হাল্কাধরণের হাস্যরসের জন্যও গঙ্গারক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়াছে। ইংলণ্ডেও সেক্স্‌পিয়ারের সময়ে ভূতপ্রেতের প্রতি সকলের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই তাঁহার নাটকে উহাদের এত ছড়াছড়ি। কথিত আছে, ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ জুয়েল রাজ্ঞী এলিজাবেথকে ডাকিনী ও

ভূতদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিষেধক গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেক্‌স্‌পিয়ার নিজেও বোধহয় ইহাদের প্রভাব বিশ্বাস করিতেন। ম্যাকবেথ, হ্যাম্‌লেট ও টেমপেষ্ট ছাড়াও সেক্‌স্‌পীয়ার জোয়ান অফ্‌ আর্ককে The First Part of King Henry VI নাটকে যুদ্ধরতা বীরাঙ্গনারূপে আঁকিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার চরিত্রে ডাকিনীভাব আসিয়া পড়িয়াছে। জুলিয়াস্‌ সিজারের মৃত্যুর পূর্ব্বে অশুভবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়—"Ghosts did shriek and squeal about the street"* জুলিয়াস সিজার নাটকের ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে ব্রুটাসের নিকট সিজারের প্রেতযোনীর আবির্ভাব হইয়াছে। 'মিড্‌সামার নাইটস্‌ ড্রিম্‌' নাটকে এথেন্সের নিকটস্থ অরণ্যে পরিরাজ্যের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। এগুলির দ্বারা সেক্‌স্‌পিয়ার যেমন সে যুগের সাধারণ ইংরাজদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকেও ভুতপ্রেতাদি তেমনি পঞ্চাশ বৎসর আগেকার বাংলাদেশের জনসাধারণের সংস্কারাদি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়।

পুরাণকে অবজ্ঞা না করিয়াও গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলিতে যুক্তির প্রলেপ লাগাইয়া আধুনিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতি দক্ষ শিল্পীর মত তিনি মেনকার বিশ্বামিত্র প্রেম 'প্রণয়ের বিমল আস্বাদ' লাভে ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রসূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই প্রেম দুঃখকাতর মানুষই দিতে পারে, নিরবিচ্ছিন্ন সুখভোগী দেবতা পারেন না। 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রের মহামহিয়সী ক্ষত্রিয় রমণীর রূপ তিনি যে ভাবে ফুটাইয়াছেন তাহা মহাভারতের 'জনা'কে ছাপাইয়া গিয়াছে। বরং মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র 'জনা' চরিত্র ও গিরিশের 'জনা' চরিত্র প্রায় এক। এমনি দু এক বিষয়ে মাইকেল প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ যদিও গিরিশচন্দ্রকে প্রভাবিত

* Julius Caesar Act II, Sc II.

করিয়া থাকেন তাহাতে লজ্জা পাইবার কিছুই নাই। কোন প্রতিভাই অতীতের দানকে অস্বীকার করিয়া বড় হয় না। সেক্‌স্‌পিয়ারের Richard II মারলোর Edward II অনুসরণে রচিত হইয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে মারলোর Jew of Malta সেক্‌স্‌পিয়ারকে চিরবিখ্যাত Merchant of Venice রচনার অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। গ্রীণের Pandosto নাটক হইতে সেক্‌স্‌পীয়ার 'The winter's tale' নাটকের গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, একদিক দিয়া মার্‌লো সেক্‌স্‌পিয়ারের ভিত্তিস্বরূপ। (১) সেক্‌স্‌পিয়ারের Coriolanus নাটকের Volumnia অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের 'জনা' চরিত্রে মাতৃ-স্নেহ ও ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রবল সংঘাত আরও চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। পুত্রের মৃত্যুর পর জনাকে বাঁচাইয়া রাখায় 'জনা' চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে, বিকশিত হইতে নাটকীয় চরিত্রকে এই সুযোগ দান নাট্যকারের প্রতিভার পরিচায়ক।

একশ্রেণীর সমালোচক বলেন, গিরিশচন্দ্রের নাটক মতবাদ প্রচার দোষে দুষ্ট। তাঁহাদের মতে নাট্যকার কখনো চরিত্রের মুখে নিজের কথা বলাইবেন না, স্বাভাবিকভাবে 'art for art's sake' নীতি বজায় রাখিয়া চরিত্রগুলি যে কথা বলিতে চাহিবে তাহাই তিনি বিবৃত করিয়া যাইবেন। এই অভিযোগ অবশ্য তর্ক অপেক্ষা রুচির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত বড় লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অধিকাংশেরই রচনায় তাঁহাদের বিশিষ্ট মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের মনে হয়—গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এ অভিযোগ উঠিতেই পারে না।

(১) Nevertheless, by force of poetry, not of dramatic art, Marlowe made a noble porch to the temple which Shakespeare built.

Stopford A. Brooke. English Literature. P. 90.

আধুনিক জীবন দর্শন বা সাহিত্যের ভিতর দিয়া জনসাধারণকে পথ দেখাইবার প্রয়াস ইংরাজীযুগের শিক্ষাব্রতীদের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যে আসিয়াছে এবং শিক্ষার গৌরব ছাড়া সে স্পর্দ্ধা কাহারও হয় না। গিরিশচন্দ্রের মত সাধারণ যাত্রাপন্থী দর্শকবৃন্দকে লইয়াই যাহারা কারবার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অতো বড় ব্যাপারে মাথা ঘামানো সম্ভব নহে। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রজেন্দ্র শীলের মত বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সময়ে ত্রিশ হাজারের বেশী ছাত্র একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সে যুগের শিক্ষিত সাহিত্যিকের রচনায় হয়তো ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত জীবনবাদ আমরা পাঠ করিতে পারি, কিন্তু নেশা ও পেশাদার থিয়েটারের নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কাছে আমরা তাহা আশা করি না।

আসল কথা হইতেছে আমাদের দেখিতে হইবে মানবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা নাট্যকার তাঁহার নাটকে কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা তিনি করেন নাই তাহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হইবে না। গিরিশচন্দ্র সাতশতাধিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোনটি হয়তো জীবনবাদ সম্বন্ধে চরিত্রোপযোগী ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া সেই বিশিষ্ট চরিত্রটিকে গিরিশ-চন্দ্রের সমগ্র রচনার প্রতিভূস্বরূপ বলা চলে না। কালিকিঙ্করের নীরস সত্যানুবর্ত্তিতার অহমিকা, রঙ্গলালের বিবেকানন্দত্ব, জনার পুত্রগৌরব ও ক্ষাত্রধর্ম্মানুরাগ, চৈতন্যদেবের ভক্তের দাসত্ব ইচ্ছা, বসুন্ধরা দুহিতা সীতার সর্ব্বংসহা ভাব, পাগল হইয়া পশুপতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বর্গবারাঙ্গনা মেনকার কন্যা, শকুন্তলার তেজদৃপ্ত মধুর রমণীমূর্ত্তি, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিমের স্বাধীন দেশমাতৃকার মূর্ত্তি কল্পনা, জহরার অন্ধ প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা,—ইহাদের প্রত্যেকটিই মানবচরিত্রের বিশিষ্টরূপ। সেই হিসাবে এইগুলির নিজস্ব মূল্যও আছে। হয়তো ইহাদের কোন কোনটির

কথায় গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতের প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহারা নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণরূপে জীবনকে আস্বাদন করিবার জন্যই নাটকে স্থান পাইয়াছে, কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে নয়।

গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। যেখানে যে ভাষা যেমন ভাবে প্রযোজ্য, সেখানে তিনি সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে, গদ্যে বা সঙ্গীতে শুধু মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখিয়া নয়, নানা পরিস্থিতির বিচিত্র আবহাওয়া তিনি ভাষার ভিতর দিয়া সার্থকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়ে মহাকবি সেক্ সপীয়ারের রুচির সহিত গিরিশচন্দ্রের মিল আছে। 'রোমিও' পদ্যে কথা বলিয়াছেন, 'ফলষ্টাফ্' গদ্যে কথা বলিয়াছেন। 'ওথেলো'র মহত্ব যখনই পাশবিক বৃত্তিনিচয়ের প্রভাবে চাপা পড়িবার মত হইয়াছে তখনই তাহার মুখে গদ্য শুনিতে পাইয়াছি। মানসিক অবস্থা অনুসারে (mood) পদ্যে ও গদ্যে চরিত্রগুলিকে কথা বলানো সেক্স্ পীয়ারের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। সাধারণ কমিক চরিত্রগুলির বেলায় সেকস্পিয়ার সবসময়েই গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও ইউরোপের মহাকবির মত এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া একই দৃশ্যে রাজবয়স্য 'বিদূষক' গদ্যে ও রাজ্ঞী 'জনা' পদ্যে কথা বলেন। (১) 'কমলে কামিনী' নাটকে মাঝিদের গান, 'মায়াবসানে' সরল আদর্শ ভৃত্য শান্তিরামের গ্রাম্যভাষা, 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে মুটেদের ভাষা (২),

(১) বিদূষক :—আজ্ঞে, হাঁ—ব'লছেন—ব'লছেন—ব'লছেন—

জনা :—তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম!

বিদূষক—আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো—তাই তো—তাই তো—তাই তো—তাই তো—(স্বগতঃ) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা!

(জনা প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

(২) ১ম মুটে—হ্যাদে ব্যাগমটা কেমনরে মামু?

সত্যানুশ্রয়ী প্রবীণ কালিকিঙ্করের দার্শনিকোচিত কথোপকথন, শ্রীচৈতন্যদেবের পরমবৈষ্ণব ভাবাপন্ন ভাষা (৩), গিরিশচন্দ্রের নাটককে স্বভাবতঃই অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছে। জীবনের সমালোচনা যদি সাহিত্য বিচারের প্রধান মাপকাঠি হয় তাহা হইলে এই সব উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ নাটকের সম্ভ্রম বৃদ্ধিই করিয়া থাকিবে।

অবশ্য নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র যে দোষত্রুটির অতীত ছিলেন একথা বলা হইতেছে না। রামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য নাট্যকার ভক্তির প্রাবল্যে মাঝে মাঝে এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন যে তাহাতে নাটকের অঙ্গহানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। নাটকের সুদীর্ঘ কথোপকথনও মাঝে মাঝে নীরস এমন কি বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। কালিকিঙ্কর উন্মত্ত হইয়া সাতকড়িকে গাউন পরাইয়া থলের ভিতর পুরিতে শান্তিরামকে যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন সেই অভিনব পরিকল্পনাটি The Merry wives of windsor নাটকের তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে Mrs. Page কর্ত্তৃক Sir John Falstaff কে ঝুড়িতে পুরিয়া ধোবার বাড়ী পাঠাইবার মত। জনার প্রথম দৃশ্যে অগ্নিদেবের কল্পতরুত্বের মাঝে তিনি অসহায় ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন। প্রবীরের 'সমকক্ষ বীরের সহিত রণসাধ' দেবতাঃ প্রভাবে সংঘটিত লজ্জাকর পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে নাই। জনার অন্তকালে জাহ্নবীর চরণ লাভ অবশ্যই পুত্র-শোকাতুরা জনার গঙ্গাজলে আত্মহত্যা নহে। শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কবহুল

২য় মুটে—ব্যাগমটা বড় জবর,—এই গোলাপ শুঁকতিছে, এই আবার নাকে গুজতিছে, মারতিছে তো ফুলের তোরা ছুরিই মারতিছে।

১ম মুটে—হ্যাদে ব্যাগমডা মাইয়া মানুষ না মরদরে মামু?

(কপালকুণ্ডলা—তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)

(৩) চৈতন্যদেব—আমি কৃষ্ণবিরহে বড় কাতর তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, ভক্তের কৃপা হবে।

(রূপসনাতন—চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

পরিচালনা অগ্নিদেবের নীলধ্বজের নিকট ভগবানের লীলার নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারাই তো নিষ্পাপ হইয়া যায় নাই (১)। তাছাড়া কোন কোন স্থানে তিনি বক্তার ও উক্তির সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই এবং সাধারণ চলিত ভাষায় তিনি অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দোষত্রুটি অতি সামান্য এবং গিরিশ-নাটকের পর্ব্বতপ্রমাণ গুণাবলীর কাছে কিছুই নহে। একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রের দুএকখানি নাটক ছাড়া বাংলার প্রথম যুগের সামাজিক নাটকের তুলনায় গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি', 'বলিদান', 'প্রফুল্ল', প্রভৃতি কত উচ্চশ্রেণীর তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখবহুল বাঙ্গালী জীবনের অজস্র সংঘাত এবং মর্ম্মান্তিক শোচনীয় পরিণতি এই সকল নাটকে ছবির মত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দর্শক তাহাদের গৃহকে খুঁজিয়া পায়। চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিবার সময় তাহারা ঘরের কথা ভুলিয়া গিয়া নাটকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে নিজেদের হারাইয়া ফেলে।

ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা এবং মিথ্যা প্রচারের বেড়াজাল ডিঙ্গাইয়া গিরিশচন্দ্র যে সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির দ্বারা সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ভ্রান্তি প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য শুধু বাংলাদেশ বা বাংলা সাহিত্য নহে, সারা ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারে। Coriolanus নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়া অনেকেই সেকস্‌পীয়ারকে undemocratic বলিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্র অসহায় মানবাত্মার প্রতি অগাধ সহানুভূতি ও বেদনাবোধ গিরিশচন্দ্রের নাটকের অমূল্য সম্পদ। পৌরাণিক নাটক তপোবল, পাণ্ডবগৌরব, রাবণ বধ, জনা, প্রহ্লাদ চরিত্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতিতে পুরাণের উপর আধুনিক বিচার ও যুক্তির প্রলেপ লাগাইয়া গিরিশচন্দ্র উহাদের চিরকালীন করিয়া তুলিয়াছেন। দেবতারা তাঁহার নাটকে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা অপরিচিতের মত আসেন

(১) 'জনা'—পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাই, নাটকের অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলির মত তাহাদিগকেও আমরা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও আপনার মনে করি। গিরিশচন্দ্রের নাটকে পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করিয়াছে। দর্শকবৃন্দকে সন্তুষ্ট রাখিবার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও তৎকালীন এমন কি আজ পর্য্যন্ত অন্যান্য অনেক নাট্য-কারের বহুঊর্দ্ধে গিরিশচন্দ্র স্থান পাইয়াছেন। এই সার্থকতা তাঁহার কালজয়ী প্রতিভারই সাক্ষ্য দেয়। তাঁহার নাটকে যে সব লক্ষ্যনীয় ত্রুটি আছে তাহাদের অধিকাংশের জন্য তিনি নিজে দায়ী নন, দায়ী তাঁহার যুগ ও সেকালের দর্শকবৃন্দের রুচি। ইহা ছাড়া সৃষ্টি সাফল্যে, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে, মানবচরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, মানসিক দৃঢ়তায়, চিন্তা, আবেগ ও ঘাতপ্রতিঘাতের অপরূপ সামঞ্জস্য বিধানে, অসামান্য কাব্যপ্রতিভায়—সবদিক হইতে বিচার করিলে গিরিশচন্দ্র আজও বাংলা দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় নাট্যকার। Macbeth অনুবাদে মূল নাটকের সুরটি চমৎকার বজায় আছে। অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়া গ্রহণ না করিলে এমন সার্থক অনুবাদ সম্ভব হয় না। নাটকের বিষয়বস্তু তিনি হয়তো অন্য কোথাও হইতে পাইয়াছেন (কথিত আছে 'বিল্বমঙ্গল' কাহিনী রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে গল্পচ্ছলে শুনাইয়াছিলেন), কিন্তু সেই সংগ্রহের মধ্যে অগৌরব অপেক্ষা তাঁহার সন্ধানীশক্তির অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা অর্থ দেয়, তাহাদের বিকৃত রুচির জন্য যদিও কোথাও কোথাও তাঁহার রচনা-শৈথিল্য দেখা গিয়াছে, তবু মানব জীবনের এত অধিক দিক তিনি ব্যবহার করিয়াছেন যাহা দেখিলে তাঁহার জ্ঞান ও ধারণার প্রসার সম্বন্ধে অবাক হইতে হয়। দেশীয় নাট্যকারের ত্রুটিগুলি থাকাতে যদিও তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হিসাবে পরিগণিত না হন, সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্য নাট্যকারগণ কোনদিক হইতে তাঁহার পাশে বসিবার যোগ্য নহেন এবং প্রেম, ঘৃণা, আশা, বিশ্বাস,

নৈরাশ্য, সাহস বা তিতিক্ষার সার্থক চিত্রনে গিরিশচন্দ্রের নাটক সর্ব্বযুগের সকল রসিক পাঠকের কাছে মূল্যবান। যোগেশের 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল', করিমচাচার মৃত মাতাল সিরাজ ও জীবিত রাজা সিরাজের সম্বন্ধে জহুরার সঙ্গে কথোপকথন, ভীমসেনের শ্রীকৃষ্ণকে—'অতিখল, অতি ছল, অতীব কুটিল, তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল'—বলিয়া দারুণ অভিমান প্রকাশ করা, সনাতনের সর্ত্ত হইতে বিনাসর্ত্তে মুক্তি লইবার পর্য্যন্ত অনিচ্ছা, চিন্তামনির নিঃস্বার্থ উপদেশ, গোলকপতিকে 'ছার রাবণ সংহার হেতু' গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিয়া ধরণীতে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করায় মহামানব রাবণের উজ্জ্বল আনন্দ—প্রভৃতিতে বাংলার নাট্যসাহিত্য চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আজকাল বাংলা নাটকে মনঃসমীক্ষণ দেখাইবার আগ্রহের প্রাবল্যে চরিত্রগুলি সকল দিক হইতে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না। এলিজাবেথের যুগ হইতে প্রথম জেম্‌সের যুগে আসিয়া ইংরাজী নাটকের এই অবস্থাই হইয়াছিল। যদিও সেকস্‌পীয়ারের পরবর্ত্তি নাট্যকারগণ (বেন জনসন, চ্যাপম্যান, মারষ্ট´ন প্রভৃতি) কিছুদিনের জন্য সেকস্‌পীয়ারের সমাদর কমাইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। সেকস্‌পীয়ার চিরকালের, কিন্তু তাঁহারা সমসাময়িক সমাজের বিশিষ্ট একটা দিক লইয়া চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যুগ-আবর্ত্তনে হারাইয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশের একমুখী আধুনিক নাটকগুলি লইয়া বাঙ্গালী বর্ত্তমানের মত চিরকাল তুষ্ট থাকিতে পারিবে কি না কে জানে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুগধর্ম্মীর নিন্দায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গিরিশচন্দ্রেরও কোন ক্ষতি হইবে না—বাঙ্গালীর নাট্যপ্রীতি ও রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সমাদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে।

নাটকের বিচার

মায়াবসান-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম, এ, বি-এল, সরস্বতী

সামাজিক নাটকে যে সকল নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত হয়, তাহারা এই বাস্তবজীবনেরই প্রাণী। অল্পবিস্তর তাহাদের ন্যায় চরিত্র ও তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী আমরা দেখিয়া আসিতেছি। সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও এই প্রকার নাটকে হইয়া থাকে। গিরিশ চন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে কন্যাদায়সমস্যা 'শাস্তি কি শান্তি'তে বিধবাবিবাহ সমস্যা যেরূপ স্থান পাইয়াছে, 'মায়াবসান' নাটকেও সেইরূপ কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথমে, রাজনৈতিক আন্দোলন ও কংগ্রেসের কার্য্য। প্রথম দৃশ্যেই পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাড়িবে, এই বিষয়টি যাদব ও মাধব কর্ত্তৃক আলোচিত হইতেছে। "বাঙ্গালী বড়লাট হবে, ছোটলাট হবে, কমিশনর হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, সাহেবেরা সব এ দেশ থেকে চলে যাবে।" হলধর যখন এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তখন কারণ দেওয়া হইল "মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, পার্শী, মাদ্রাজী সব এক হয়ে Political Brothers হবো।" কিন্তু এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিকটিও গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালী বড়লাট, ছোটলাট হইতে চায় বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিবে কে? তার জন্য অবশ্য গোরা থাকিবে। মাধব বলে "যদি থাকে ত দুচার জন গোরা, দুই একজন কাপ্তেন, কর্ণেল, কম্যাণ্ডর-ইন-চিফ্। খুব কম মাইনে। মাসে জোর দশ হাজার টাকা।" মনে করি না যে গিরিশচন্দ্র ভারতবাসীর শক্তির বিষয় অনভিজ্ঞ ছিলেন। "হীরক জুবিলি"তে তিনি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট কেন এত বেতনভোগী গোরাসৈন্য? কেন এত অর্থব্যয়? চেয়ে দেখ, বলবান

রাজভক্ত রাজপুত সন্তান দণ্ডায়মান। চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবৎসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মাদ্রাজী, পার্শী অসিকরে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই। আমরাই তোমার দৃঢ় প্রাচীর।" এমন কি বঙ্গবাসীর মুখেও ইহারই অনুরূপ উক্তি দিয়াছেন "তোমার শ্বেতসন্তানের পাশে পাশে অস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে তোমার অরির সম্মুখীন হব, হীন হয়েও বড় আশায় আশ্বাসিত হয়ে আছি।" সময়ের উপযোগী মন্তব্যই মায়াবসানে প্রকাশ। ভ্রাতৃভাব শুনিতে বেশ। হিন্দু, মুসলমান, মারহাট্টা প্রভৃতি এক হবে ভাবিতেও বেশ। কিন্তু যাঁহারা এই ভাতৃভাব সৃষ্টি করিবার উদ্যোগী, তাঁহারা মনে করেন যে "মিটীংএ নবাবসাহেবকে Shake করে Receive" করলেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাব দেখান হইল। সেই নবাব সাহেবেরই "কাছারী লুঠ করবার জন্য লেঠেল পাঠাতে" আপত্তি নাই, কেন না সে "বিষয়কর্ম্ম।" গিরিশচন্দ্রের বিদ্রূপ এই ভণ্ডগণের প্রতি, তাঁহার তীব্র আক্রমণ বৈধ রাজনৈতিক উন্নতির বিরুদ্ধে নহে। কালীকিঙ্করের মুখে গিরিশচন্দ্র বলাইয়াছেন "আপনারা বলছেন, Political unity হয়েছে, আর রাজ্যশাসনের ব্যয় কমাতে চান, ভাল, যে ব্যয় কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটিই আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত করে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন। তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট-ফি বেঁচে যাবে, কৌন্‌সুলিরা কাঁড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সে টাকা দেশে থাকবে। চরক বলেন, যে দেশ উকীল-প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবির সংখ্যাবৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম কারণ।" * * * "মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড়-লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন।" [১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক]

কংগ্রেসের প্রতি আজকাল জনসাধারণের যেরূপ মানসিক ভাব, মায়াবসান রচনার সময় সেরূপ ছিল না। তখনকার বিশ্বাস যে, আন্দোলন দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে, কিন্তু আন্দোলন দ্বারা ছোটখাট ছুচারিটি বিষয় সিদ্ধ হইলেও আসলে গিয়া যে বাধিবে, কালীকিঙ্করের মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র তাহা বলাইয়াছেন "ভারত-অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ কর্‌বেন ?"

মায়াবসানে বাঙ্গালীর অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, প্রকারান্তরে তাহার উপদেশও দেওয়া হইয়াছে। মায়াবসান যখন অভিনীত হয়, তখন স্বদেশীর কথাও লোকে শোনে নাই। তখন বিলাস বাড়িয়া যাইতেছিল। ইংরাজের আদর্শে রাজনৈতিক বক্তার উদাহরণ যাদব ও মাধব। তাঁহারা একজন কথা কহিতে আরম্ভ করিলে অপরজন রাজনৈতিক সভার নিয়মে "ঘড়ি ধরিয়া আধ ঘণ্টা চুপ করে" থাকেন, একজনের কথা কহিবার সময় আর একজন কথা কহিলে "Unparliamentary বলে মুখ চেপে ধরেন। কিন্তু যাহাতে সাধারণের শিক্ষা হয়, সেরূপ কার্য্য ইহাঁর অল্পই করেন। কালীকিঙ্কর বলে "চক্ষের উপর দেখছেন, দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজীচালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় কর্‌তে পারে না। * * * এমন কুটীর নাই যেখানে মদের বোতল, বিলিতি বোতাম, সাবান সেধুন নাই। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতচারী হ'তে বলুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দিনদরিদ্রের সাহায্য করুন।" * * * "আমি ইংরাজের অনুকরণের বিরোধী, ইংরাজের আচার-ব্যবহার ইংরাজের উপযোগী। ভারতের অহিতকর।" [১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক]। তাই সাহেবী চাল যাঁহারা অনুকরণ করে, সেই কৌনসুলীগণকেও তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]।

মায়াবসানে উকীল, এটর্ণি ও ব্যারিষ্টারগণের উচ্চতম আদর্শও ইঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণধন বসু ও সিদ্ধেশ্বর দাস এটর্ণিদ্বয়ের নিকৃষ্ট চরিত্রে ব্যবহারজীবিদের ব্যবহারের উপর ঘৃণা আসে; টি, রের মত ব্যারিষ্টারের চরিত্রে সে ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মিঃ ডোর উল্লেখ করাতে মায়াবসানে ব্যবহারজীবির আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইনি বলেন "সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কার্য্য কর্‌তে পারবো না।" "দুপক্ষ খায়" এমন এটর্ণি ও কোন্‌সুলী আছে বটে, কিন্তু আবার এমন উকীলও আছে, যিনি বলেন "আমরা জোচ্চুরি নিবারণ কর্‌বো হলপ করেছি। বিচারের সহায়তা করা আমাদের কাজ। রাণীর আইন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম।" [৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]। ব্যবহার-জীবির আদর্শ কৃষ্ণধনের অনুতাপের পর প্রতিজ্ঞায় প্রকাশ "অন্যায় নিবারণ কর্‌বো। দুর্ব্বলের পক্ষ হ'ব। অত্যাচারীর বিপক্ষ হ'ব। Lawএর গৌরব রাখবো। Justiceএর সাহায্য কর্‌বো।" [৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]।

তৃতীয়তঃ, পুলিস কর্ম্মচারীর উচ্চ আদর্শও মায়াবসানে বর্ণিত। দিনু ইন্‌স্পেক্টরকে উপলক্ষ করিয়া সেই কথাগুলি অবতারিত। কালীকিঙ্কর দিনুকে বলিলেন "তোমরা লোকরক্ষক। মহারাণী তোমাদের লোকরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন। যদি কায়মনো-বাক্যে কর্ত্তব্যসাধন কর্‌তে, যদি যমের ন্যায় লোকে তোমাদের না ভয় কর্‌তো, রক্ষক বলে জ্ঞান কর্‌তো, তা হ'লে কি চুরি, ডাকাতি, খুন চাপা থাকে? যদি পদবৃদ্ধি উপেক্ষা কর্‌তে, যদি কর্ত্তব্য একমাত্র অবলম্বন কর্‌তে, তা হ'লে হ'তে পারে যে তোমার উপরস্থ লোক তোমায় অকর্ম্মণ্য ভাবতো; কিন্তু নিরপেক্ষ ভগবান তোমার কার্য্য দেখতেন। কর্ত্তব্যসাধনে উপস্থিত ত্যাগস্বীকার কর্‌তে, হয় সত্য কিন্তু পরিণাম অতি উজ্জ্বল। এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

তোমাদের পুলিসে অনেক পাবে। তাঁহারাই যথার্থ শান্তিরক্ষক।" [৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]। দীর্ঘ হইলেও উপরের অংশ উদ্ধৃত হইল। আদর্শ পুলিসকর্ম্মচারী আমাদের দেশের এক প্রধান অভাব।

মায়াবসান নাটকে বিজ্ঞানচর্চ্চার উল্লেখ আছে। গিরিশচন্দ্র নিজে বিজ্ঞানানুরাগী ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েসনে তিনি নিয়মিত বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন। অতি সামান্য কাজ শিশি ধোওয়া হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সমূহও করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধও আছে। মায়াবসানের কালীকিঙ্কর চরিত্রে এই বিজ্ঞানানুরাগ প্রকটিত। কালীকিঙ্কর সমস্ত জীবন বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। "সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে দূরবীক্ষণে আকাশে তাহার গতি লক্ষ্য করেছি। অনুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যবহার দেখেছি। বিজ্ঞানচর্চ্চা, জীবন উপেক্ষা করে তাড়িৎ পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি।" [৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]। এই বিজ্ঞানকে অনেকে উপহাসও করে। তাহাদের কথাগুলি যেন হলধরের মুখে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক জুল্ ভার্ণের উপন্যাসের কাহিনীর ন্যায় (From the earth to the moon) হলধর বলে "ছোট মামাবাবু হাউই তৈয়ার করেছেন, হাউইয়ের মুখে বস্‌বো, ছোট মামাবাবু পল্‌তের মুখে আগুন দেবে, আর সোঁ করে গে চাঁদে উঠব।" সূর্য্যের তাপে রান্না এখন আর অদ্ভুত শোনায় না। ব্যোমপথে পুষ্পকযানের গমন আর উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বিজ্ঞানের বলে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। বিন্দু বলে "বিদ্যের জোরে যা বল্‌ছে, তা তো করছে। একদিনে কাশী যাওয়া সেকালে গল্প ছিল, তারের খবর, তার দিয়ে কথা শুনা, এও ত'হল, সূর্য্যের আলোয় আত্তসী কাঁচ ধরলে টিকে ধরে।" [১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]।

মায়াবসানে প্রধান চরিত্র কালীকিঙ্কর। সেক্সপীয়র টেম্পেষ্ট নাটকে প্রস্‌পেরো চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রস্‌পেরো রুদ্ধকক্ষে প্রেততত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। যাদুবিদ্যার মোহন সঙ্গীত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যভার ভ্রাতার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সেই ভ্রাতা সুবিধা বুঝিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। রাজ্যচ্যুত প্রস্‌পেরো কন্যাকে লইয়া বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কালীকিঙ্করও বিজ্ঞানচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই স্থির করিয়াছিল। সাতকড়ি বলে "এঁর খুড়ো ত পাগলই, রাতদিন কি করেন জানেন, চেষ্টা কচ্ছেন আলো জ্বালবেন না, রাত্রে সূর্য্যির আলো ধরে রাখবেন, সূর্য্যির তাতে ভাত রাঁধবেন, এম্‌নি আলো তৈয়ার করবেন যে ঘরে বসে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ দেখবেন, শূন্যে জাহাজ চালাবেন, পাগল কাকে বলে বলুন ?" [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]। এই উক্তি ও পূর্ব্বোল্লিখিত হলধরের ব্যঙ্গ কালীকিঙ্করের প্রতি সাধারণ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে। এমন কি অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত কালীকিঙ্করের আচরণ উন্মাদের ন্যায় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। জগতে কাহারও কোন অসাধারণ শক্তি দেখিলে মানবেরা তাহাকে সয়তান আশ্রিত বলিয়া স্থির করিত। ডাকিনী আখ্যায় বিলাতে বহু নারীর প্রাণসংহার হইয়াছিল। অশিক্ষিত লোকে কালীকিঙ্করকে পাগল বলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকও ত আছে। কাজেই কালীকিঙ্করকে পাগল সাজাইবার জন্য ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইল।

মায়াবসানে দুইটি বিপরীত চরিত্র কালীকিঙ্কর ও সাতকড়ি। পরের উপকার কালীকিঙ্করের জীবনের ব্রত ও পরের অপকার সাতকড়ির জীবনের ব্রত। কালীকিঙ্কর পরোপকারে যে তৃপ্তিলাভ করিতেন, সাতকড়ি পরের অপকার করিয়া সেই তৃপ্তি পাইত। কালীকিঙ্করের

জীবনের প্রধান লক্ষ্য পরোপকার। তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতেন অর্থের জন্য নয়, যশের জন্য নয়, খেয়ালের বশে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও নয়। তাঁহার বিজ্ঞানচর্চ্চা মানুষের উপকারের জন্য। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল, গভীর চিন্তালব্ধ অমূল্য তথ্যনিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। "কেন জান? ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ কর্‌লে মানুষের উপকার হ'বে।" [৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]। মোকদ্দমা করে দেশের লোক গরীব হয়ে পড়ছে, মদের দোকানে কত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে, ইংরাজী চাল-চলনের অনুকরণে, বিলাসের উত্তাল তরঙ্গে শত শত নরনারী সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। কালীকিঙ্করের হৃদয়ে শেলের ন্যায় ইহা বাজিতেছে। কংগ্রেস করিয়া আগে এই সব নিবারণ করিতে তিনি ব্যাকুল। [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক] দুর্ভিক্ষের হাহাকার তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে। "এই ফেমিন হয়েছে, গরীবের উপকার করবার সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত।" [১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক]। অপরিচিতা বিন্দু ও তাহার কন্যা রঙ্গিনীকে কালীকিঙ্কর কিরূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা বিন্দুর কথাতেই প্রকাশ "সাহেব-ডাক্তার দিয়ে ছোটকর্ত্তা আমার চিকিৎসা করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হ'লে খরচ করে, সেইরূপ অকাতরে ব্যয় করেছেন * * *" [৩য় অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য]। "চাকর দাসী দিয়ে (আমি টের পেতুম না), দোকানকে দোকান কিনে নিতেন," * * * "ছোটবাবু কাপড়ের দোকান করে দিলেন।" কালীকিঙ্কর বিবাহ করেন নাই। বলেন "আমার বিবাহ নিয়ে বড় বৌঠাকরুণের সঙ্গে ঝগড়া হয়। তিনি সম্বন্ধ করেছিলেন বলে আমি তাঁর কাছে সাতদিন খেতে যাই নি। আমার ইন্দ্রের মতন তিন ভাইপো—বে করে কেন সংসারী হ'ব।" পরের জন্য কালীকিঙ্কর নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। অন্নপূর্ণা ঔষধ বলিয়া যখন বিষ খাওয়াইল, তখন ভূপতিত কালীকিঙ্কর

সংজ্ঞালুপ্ত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া অন্নপূর্ণাকে বাঁচাইবার জন্য বলিল "মা, চেঁচিও না, চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাকৃতে থাকৃতে লিখে দিই যে আমি আপনি খেয়েছি।" [১ম অঙ্ক, শেষ গর্ভাঙ্ক]। কি আদর্শ চরিত্র! সেক্সপীয়র চিত্রিত ওথেলোর প্রণয়িনী দেস্‌দিমোনা স্বামী ওথেলো কর্তৃক মিথ্যা সন্দেহে যখন নিহত হইয়াছিল, তখন সেই দেবীও জীবনের শেষ শক্তিটুকু সহায় করিয়া ওথেলোকে বাঁচাইতে বলিয়াছিল "আমায় কেহ মারে নাই। আমি আত্মহত্যা করিয়াছি।" * কিন্তু কালীকিঙ্কর মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। পরকে বাঁচাইতে, এমন কি চির স্নেহের অন্নপূর্ণাকে রক্ষা করিতেও তিনি মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। বলিলেন "না, মিছে হবে।" এই প্রবল সত্যানুরাগ কালীকিঙ্করের জীবনের দ্বিতীয় বৈচিত্র্য।

পরোপকার ও সত্যানুরাগ কালীকিঙ্করের জীবনে এই দুইটি বৃত্তির খেলা। এই সত্যানুরাগবশতঃই তিনি অন্নপূর্ণাকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলিতে পারেন নাই। যাদব মাধবকে বাঁচাইবার জন্যও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হন নাই। "মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না। সত্যের সংসার সত্যপথই নিরাপদ পথ। * * * আমার কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা যে মান ধন মমতা প্রাণ যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ অবলম্বন না করি। মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে।" [৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]। অন্যায় করে বিষয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, তিনি সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। বলিতেছেন "আমি কাগজপত্র দেখেছি কতকগুলো অন্যায় করে বিষয় নেওয়া হয়েছে,

* Emilia: O who hath done this deed?
Desdemona: Nobody; I myself. Farewell.
[Othello. Act. 5. Sc. 2.

ওসব ভাল নয়। নাবালক, বিধবা, দরিদ্র, সে সব ফিরিয়ে দে। যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয়, সত্য বল্‌তে হবে, ফিরিয়ে দে, আমার খরচা থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি। [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক]। এমন কি কালীকিঙ্কর সত্য কথা বলিলে যদি মাধবের জেলও হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। ভ্রাতুষ্পুত্র জেলে যায় যাক্—কালীকিঙ্কর সত্যপথ ছাড়িবেন না। যাদবের একটি কথায় কালীকিঙ্করের এইরূপ মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাদব সিদ্ধেশ্বরকে বলিতেছে "গঙ্গাধর মুখুয্যের একটি তালুক ছিল, দেনার জ্বালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন।" (এই বিক্রী হওয়াটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বলাই বাহুল্য, এই ছলে বিষয়টি ফাঁকী দিয়া লওয়া হয়।) তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা মামলা মোকদ্দমা করে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে। কাকা ম'শায়ের ধারণা যে তালুকটি ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস্ উনি ব্যামোয় পড়্‌লেন, নৈলে মেজদাকে জেলে দিয়েছিলেন আর কি ?' [২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]।

কালীকিঙ্কর কোমল হৃদয়। পরের দুঃখে হৃদয় না গলাইলে কেহ আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পরসেবায় প্রবৃত্ত হয় না। রঙ্গিনীর মুখ হইতে কালীকিঙ্করের এই কোমলহৃদয় ও পরোপকারের জ্বলন্ত চিত্র আমরা পাইয়াছি। এ সংসারে এমন লোক আছে যে প্রত্যুপকার পাইবার জন্ত উপকার করে। কিন্তু কালীকিঙ্কর নিঃস্বার্থভাবে পরহিতে রত। "যে লাভালাভ বিবেচনা করে, সে ধর্ম্মপথে চল্‌তে পারে না, সত্য বল্‌তে পারে না, পরোপকার কর্‌তে পারে না। [৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। মানবের নিকট প্রত্যুপকারের আশা করা সম্ভব, কিন্তু জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রত্যুপকারের আশা রাখে না। কালীকিঙ্কর প্রত্যুপকারের আশা ত করিতেনই না, নিজের প্রাণসংশয় হইলেও পরোপকার করিতেন। রঙ্গিনী বলে "মারীভয় উপস্থিত হলে, কুটীরে কুটীরে মুমূর্ষু ব্যক্তির

সেবা কর্‌তে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উন্মত্ত দেখেছি, সামান্ত জীবজন্তুর দুঃখে ব্যাকুল হ'তে দেখেছি।" [৫ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]। এই অসীম প্রীতি ও দয়ার নির্ঝর কালীকিঙ্করের অন্তঃকরণ।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিনীর ভালবাসার চিত্র নাটকখানির মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভালবাসা লালসার পঙ্কে মলিন নহে। স্পষ্ট কোথাও খুলিয়া বলা হয় নাই, কিন্তু এক একটি বাক্য হইতে আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি, কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিনীর ভালবাসা কত গভীর। রঙ্গিনী বলে "আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস করেছে? কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে? তিনি। * * * আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজ মাত্র। সেই বীজ তাঁর যত্নে অঙ্কুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃতফল ধরেছে।" কালীকিঙ্কর যখন সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তখন রঙ্গিনীর জন্ত তাঁহার প্রবল চিন্তা। অন্ত সমস্ত বৃত্তিগুলি শুষ্ক, কেবল রঙ্গিনীর প্রতি ভালবাসা সর্ব্বদাই সজীব। কালীকিঙ্কর বলিতে পারেন, পৃথিবী শ্মশান হ'লেও তাঁর ব্যথা লাগে না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজ অন্তঃকরণের দিকে চাহিয়া রঙ্গিনীকে বলেন "এক জায়গায় ব্যথা আছে, এক জায়গায় ভাবনা আছে। আমি আর কিছু ভাবিনে, কিছু ভাবিনে, তোর জন্তে ভাবি।" রঙ্গিনীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস "আমি আবদ্ধ হয়েছি, তিনি (কালীকিঙ্কর) জান্‌লে, তাঁর মস্তিষ্কের চঞ্চলতা দূর হবে, কিরূপে আমায় উদ্ধার কর্‌বেন, তার চেষ্টা পাবেন। উভয়ের এই ভালবাসা শেষে জগতের নরনারীর ভালবাসাতে পরিণত হইল। স্বার্থ, আত্মতৃপ্তি বিসর্জ্জিত পরকার্য্যে উভয়ের জীবন উৎসর্গীকৃত। এই উভয়ের মিলন। "অবিচ্ছিন্ন মিলন! প্রতি পরমাণুতে মিলন! অনন্ত মিলন!" উভয়েই জগতে মিশিয়া গেল।

কালীকিঙ্করকে সংসারে বহু যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছিল, সত্যপথ যদিও তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, পরোপকার যদিও তাঁহার জীবনের ব্রত, তথাপি জীবনে তিনি বহু ক্লেশ পাইয়াছিলেন। পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কালীকিঙ্কর নিজ জীবনের সুখের আশা ও একে একে কিরূপ সুখের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল তাহার পরিচয় দিয়াছেন। "গোকুল মলে আমিও কেঁদেছিলুম। * * * বারিধারার ন্যায় চক্ষে জল পড়েছে, বুক ভেসে গেছে, মাটি ভেসে গেছে। বৌঠাকরুণ মলে ভেবেছিলুম যে আবার মাতৃহারা হলুম। * * * দাদা ম'লো, ইন্দ্রপাত হ'ল।" এই সকল সাংসারিক শোকের প্রবল দাহনে ভস্মপ্রায় চিত্ত যখন অকৃতজ্ঞতাবিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার ক্লেশ কি অপরিসীম! যে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য তিনি নিজ জীবনের সুখাশা বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহ করেন নাই, তাহারা যখন তাঁহাকে পাগল সাজাইল, তাঁহার স্নেহের অন্নপূর্ণা যখন যাদব ও মাধবের অত্যাচারে গৃহত্যাগিনী, তখন তাঁহার প্রাণে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, প্রলয়বাত্যার ন্যায় তাহা সুভীষণ। তিনি উন্মাদরূপেই প্রথিত হইতে চান। ইচ্ছা করিলে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন, কিন্তু পাগলের ভাণ করিলে তাঁহার জ্বালা অনেকটা জুড়ায়। 'ভ্রান্তি'তে অন্নদা এইরূপ পাগলের ভাণ করিয়া অনেকটা নিজের হৃদয়ব্যথা জুড়াইয়াছিল। কালীকিঙ্করের উন্মত্ততাও সেইরূপ। এই উন্মত্ততার লক্ষণ কালীকিঙ্কর নিজেই দিয়াছে "আরাম হইনি কেন জান? আগে কেন পাগল হয় শোন। পুত্রশোকে পাগল হয়, ভাল হ'লে তার ছেলেকে মনে প'ড়বে, যন্ত্রণায় প্রাণ বেরুবে, তাই পাগল থাকে। সর্ব্বস্বান্ত হয় পাগল হ'য়, ভাল হয়ে দেখবে আশ্রয়হীন, প্রাণের মমতা থাকবে না। পেটের ছেলে খুন কর্‌তে এসেছে, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়েছে, ভাল হলে মনে পড়্‌বে আবার পাগল হ'বে। মর্‌তে চাইবে না। যন্ত্রণা সঙ্গে থাক্‌বে। অকৃতজ্ঞতা বিষ রাবণের চুলীর মত জলে,

ম’লেও চুলী জ্বল্‌তে থাকে, জ্বালা নেভে না।” কালীকিঙ্কর এই অকৃতজ্ঞতাফণীর দংশনে জর্জ্জরিত। তাই পাগল হইয়া জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিতেন।

এই উন্মত্তাবস্থায় কালীকিঙ্করের চিত্তে বিবিধ বিরোধী প্রবৃত্তির কি ভীষণ দ্বন্দ্ব। অকৃতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়, ডাক্তার, উকীল একত্রিত। [২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক]। তাঁহার জ্বালাময়ী শ্লেষবাণী তাহাদের দগ্ধ করিতে লাগিল। কষাঘাত অপেক্ষাও এ তীব্র শ্লেষ অসহ্য। এই উন্মত্তাবস্থাতেই সেই সাতকড়িকে থলির মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিবার অভিনয়। এ অভিনয় হাস্যরস উদ্রেক করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কালীকিঙ্করের মানসিক অবস্থা ভাবিয়া আমাদের হাসি মিলাইয়া যায়। লীয়র উন্মত্তাবস্থায় অকৃতজ্ঞ কন্যাদ্বয়ের কাল্পনিক বিচার করিতে উদ্যত হইলে আমাদের হাসি আসে না, উন্মাদ লীয়রের শোকাবহ মূর্ত্তি আমাদের মনে ক্ষোভের অনলপ্রবাহ ছুটাইয়া দেয়। কালীকিঙ্করের এই নাটকাভিনয়ও * আমাদের মনে তেমনি ভাব উপস্থিত করে। যে কালীকিঙ্কর হলধরকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল “চাটুয্যে দুর্জ্জন

* গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়র কৃত Merry Wives of Windsor নাটকের উল্লেখ এই দৃশ্যে করিয়াছেন। সেই নাটকে ফলষ্টাফ (Falstaff) Mrs. Ford ও Mrs. Page নাম্নী ভদ্রমহিলাদ্বয়ের অবৈধ প্রণয় প্রার্থনা করে। মহিলাদ্বয় উভয়েই সাধ্বী। কৌতুক করিবার জন্য ফলষ্টাফ্‌কে গৃহে আনাইয়াছিলেন। এই সময় সত্যই Mrs. Fordএর সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামী আসিয়া পড়ায় ফলষ্টাফ্‌কে এক ঝুড়িতে পুরিয়া রজকগৃহে প্রেরণযোগ্য মলিন বস্ত্রে ঢাকিয়া ভৃত্যস্কন্ধে চালান দেওয়া হয়। পূর্ব্ব হইতে শিক্ষিত ভৃত্যগণ ফলষ্টাফ্‌কে ঝুড়িশুদ্ধ জলে ফেলিয়া দেয়। সেই দৃশ্যটি মায়াবসানের ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে উল্লিখিত।

হ'তে পারে, কিন্তু সে দুর্জ্জন দমন্ কর্‌বার তুমি কে?" [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক]। সেই কালীকিঙ্কর যখন সেই চাটুয্যেকেই উন্মত্তাবস্থায় পীড়ন করিতে আরম্ভ করে, তখন কালীকিঙ্করের মনের প্রবল বিক্ষোভ ভাবিয়া আমরা স্তম্ভিত হই।

কিন্তু এই উন্মত্তাবস্থা সহজেই কালীকিঙ্কর কেন দূর করেন নাই? পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্বালা ভুলিবার জন্য। কিন্তু আরও হেতু আছে, প্রকৃতিস্থ হইলে পাছে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হয়, পাছে বলিতে হয়, অন্নপূর্ণা সত্যই বিষ দিয়াছে, তাই পাগল থাকা ভাল। কালীকিঙ্করের নিজের উক্তিই তাহার সাক্ষী—"জ্ঞান হওয়া ভাল না, সত্য বিষ! সত্য বিষ! পোর্টে মিশিয়ে দেছে। জ্ঞান হ'লে প্রমাণ হবে, পাগল হওয়া ভাল, পাগল হওয়া ভাল!" পরে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তীব্রস্বরে বলেন, "মরা আরও ভাল। মরা আরও ভাল।"

প্রস্‌পেরোর সহিত কালীকিঙ্করের তুলনা করিয়াছি। শত্রুগণ যখন প্রস্‌পেরোর করগত, তখন তাহাদের বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া চৈতন্য জন্মাইয়া প্রস্‌পেরো শেষে তাহাদের ক্ষমা করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কালীকিঙ্কর প্রকৃতিস্থ হইবার পর যাদব ও মাধব যখন তাঁহার শরণাপন্ন, কাতরকণ্ঠে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, তখন পূর্ব্বকথা বৃশ্চিকদংশনের জ্বালার ন্যায় কালীকিঙ্করের মনে রহিয়াছে। তাই ক্রোধে, প্রতিহিংসার তাড়নে, তিনি যাদব ও মাধবকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রঙ্গিনী আসিয়া জানাইল "মার্জ্জনা, মার্জ্জনা। সকলকে মার্জ্জনা। শত্রুকে মার্জ্জনা।" কালীকিঙ্করের দুর্ব্বলতা তখনই দূর হইয়া গেল! তিনি সকলকে মার্জ্জনা করিলেন।

কিন্তু শেষে কালীকিঙ্করের অবসাদ আসিল। বলিলেন "পরের জন্য অনেক সয়েছি, অনেক ভেবেছি, আর কেন? আজ থেকে আমি আমার।" এই দুর্ব্বলতাও দূরীভূত হইয়া গেল। রঙ্গিনী এবার আসিয়া

জানাইল "জীবন সুখের জন্য নয়, সাধনের জন্য।" তখন ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কালীকিঙ্কর কর্য্যে রত হইলেন। এবার নিষ্কাম কর্ম্মের সূচনা। এতদিন তিনি সুখ-আশায়, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার জন্য বা আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করিতেন। ফলকামনা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। শেষে এই ফলকামনা বিসর্জ্জিত হইল। এবার হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম। রঙ্গিনীকে সহায় করিয়া কালীকিঙ্কর বিশ্বহিতে নিরত হইলেন। তাঁহার মায়ার এই অবসান।

মায়াবসানে কর্ম্মতত্ত্ব প্রকটিত। কোন্ কার্য্যের কি ফল হইবে মানববুদ্ধিতে তাহার নির্ণয় অসম্ভব। সংসারে ভাল মন্দ মিশ্রিতভাবে বর্ত্তমান। মানব নিজ বুদ্ধিবলে কোনও কার্য্য হইতে ভাল ফল উৎপন্ন হইবে বলিয়া সেই কার্য্যে রত হয়। কিন্তু ফল ত আর মনুষ্যের আয়ত্বাধীন নয়। যে কার্য্যে নিশ্চয় সুফলই হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সেই কার্য্য হইতেই কত কুফল ঘটিতে থাকে। গিরিশচন্দ্র "কর্ম্ম" প্রবন্ধে এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধটি পৃথক্ সময়ে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইলেও, মায়াবসানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মায়াবসানের মধ্য দিয়া কর্ম্মতরঙ্গিণীর যে লহরীলীলা প্রদর্শন গিরিশচন্দ্রের অভিলাষ, তাহার স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটিতে প্রকাশ। দুই একটি উদাহরণ দিলেই ইহা প্রতীত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সুফল ঘটাইতে গিয়া মানুষ কুফল উৎপাদন করিয়া থাকে। 'কর্ম্ম' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন "আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্য্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্য্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে। ফল ত আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য্য করিতে গিয়া কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্তের বাটীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম,

তাহার পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম। দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কর্ম্মক্ষম শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম।”

এখন দেখা যাক্, পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সার্থকতা মায়াবসানে কিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবসানের সকল গোলযোগের সূত্রপাত যাদব ও মাধবের কলহ। এ কলহ অল্পেই মিটিয়া যাইত কিন্তু হলধর সাতকড়িকে একটি কথা বলাতেই ঘটনাস্রোত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। হলধর সাতকড়িকে বলিল “ছোটদাতে মেজদাতে ভারি ঝগড়া, ঘুষোঘুসি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।” সাতকড়ি অমনি দুই ভাই যাহাতে ভাব না করিয়া বসে তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। হলধরের এই কথা হইতে গৃহবিচ্ছেদ, কালীকিঙ্করকে বিষদান, অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটিয়াছিল। হলধর পরোপকারী। সাতকড়ি সর্ব্বদাই পরের অনিষ্টপ্রয়াসী। হলধরের ইচ্ছা হইয়াছিল সাতকড়িকে প্রকারান্তরে শাসিত করা। মিথ্যা কথা বলিয়া সাতকড়ির পয়সা খরচ করাইয়া বাজার করিয়া মজা দেখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কথা বলিল। কিন্তু তখন হলধর স্বপ্নেও ভাবে নাই, এই সামান্য কার্য্য হইতে পরে কি ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইবে। বিপদের ঘোর ঝটিকা বহিয়া যাইবার পর হলধরের হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল। আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া সে বলিল, “পাপের বিচি, বটগাছের বিচির বাবা! চাটুর্য্যেকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি পুতলুম, দিব্যি ফল-ফুলে দিগ্ব্যাপী সাজন্ত গাছটি হয়ে উঠেছে। বটগাছ বাড়ী ভাঙ্গে, আমি গাছ হয়ে সংসার ভাঙলুম।” [৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক] হলধর যেন মন্দের প্রতিকূলে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। দুর্জ্জনকে শাস্তি দিতে সে অন্যায় করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। প্রতারক গণককারকে সে বিবিধপ্রকার লাঞ্ছনা করিয়াছিল। এই সময় হলধর বহু ভাণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহার এইরূপ আচরণ যে সঙ্গত নহে, কালীকিঙ্কর স্পষ্টাক্ষরে তাহা বুঝাইয়া দিয়া-

ছিলেন। কালীকিঙ্কর হলধরকে সাবধান করিয়াছিলেন—"পরোপকারী লোকমাত্রেই পরের অপকারীর উপর রাগ করে শাস্তি দেবার চেষ্টা পায়, এমন কি শাস্তি দেবার জন্ত কুকাজও করে, যেমন তুমি করেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো, যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না। প্রথমতঃ কুচিন্তা দ্বারা মন কলুষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কুকার্য্যের দ্বারা কুফল ফলে।" হলধর কিন্তু এ উপদেশ পালন করে নাই। আরও দুইবার সে দুর্জ্জনদমনে অন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। [২য় অ, ৫ম গর্ভাঙ্ক ও ৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক] কিন্তু শেষে অন্তরের জ্বালায় তাহাকে বলিতে হইয়াছিল, "আমার নরকেও কি স্থান আছে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, ছোটমামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি; যদি তুষানল হয়, তাও কর্‌বো।"

এখন দেখা গেল, হলধর সুফল ফলিবে বলিয়া কতকগুলি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহা হইতে বহু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। কোনও কার্য্য করিলে, পরে কি ফল উৎপন্ন হইবে তাহা জানা অসম্ভব। হলধরের কার্য্য পরে অনেক দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

কার্য্য ও কারণের চিরন্তন সম্বন্ধ। কোনও কারণে একটি কার্য্য হইল, এই কার্য্যটি আবার আর একটি কার্য্যর কারণ হইবে। আমরা কার্য্যটি করিলাম, কিন্তু ইহা কিসের কারণ হইবে তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই কথায় পূর্ব্বের উদাহরণে পরিস্ফুট হইয়াছে। রঙ্গিণীর মুখেও এইরূপ কথা "কার্য্যকারণ অনন্তকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ, আজ যেটা কার্য্য, কাল সেটা কারণ; আবার কালকার কার্য্য, পরশুর কারণ; কার্য্যকারণ স্থির করা, কার্য্যফল বিচার করা মানবশক্তির অতীত।" মায়াবসানে রঙ্গিনীর কার্য্যফলের দৃষ্টান্তে ইহা সপ্রমাণ হইবে।

অন্নপূর্ণাকে পুলিশের হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্ত রঙ্গিণী ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। ইহাতে অন্নপূর্ণা নিরাপদ হইলেন। কিন্তু যাদব ও মাধব বিপন্ন, তাহাদের বুঝিবা কারাবাসে যাইতে হয়। মন্দাকিনী ও নিস্তারিণী (মাধব ও যাদবের পত্নী) অকূলপাথারে পড়িল। রঙ্গিনী দেখিল, কি কার্য্য করিতে গিয়া কি ফল দাঁড়াইয়াছে। গিরিশচন্দ্র মায়াবসানে এই কর্ম্মের গতিই দেখাইয়াছেন। কার্য্যফলে মানবের যে কোনও হাত নাই, তাহা হলধর ও রঙ্গিণীর কার্য্য হইতেই বুঝা যাইবে। হলধর সৎউদ্দেশ্তে মন্দ কার্য্য করিয়াছিল, রঙ্গিনী সৎ-উদ্দেশ্তে সৎকার্য্য করিয়াছিল। উদ্দেশ্ত যাহাই হউক, তাহাদের কার্য্যের পরিণাম কি হইবে, তাহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহা হইলে উপায় কি? আমরা কি একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব? তাহা কি সম্ভব? কালীকিঙ্করের বাক্য স্মরণ হয়, "নিষ্কম্প দীপশিখার স্তায় মন। শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা। কিন্তু এ কি সম্ভব? কখন না। কল্পনা-মাত্র। প্রলোভন-বাক্য। সুখদুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ু-সঙ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপ নির্ব্বাণ সম্ভব। নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব। স্বভাবে অসম্ভব। ঐ যে দীপ কম্পিত হচ্ছে, প্রবলবায়ুতে নির্ব্বাণ হবে, বায়ুহীন হলেও নির্ব্বাণ হবে।" এ বাক্যের অর্থ কি? কর্ম্মহীন মনই নিষ্কম্প দীপশিখার স্তায়। "আত্মদর্শনে যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, যাঁহার মন সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের স্তায় অবস্থান করে, তাঁহারই কেবল কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল এরূপ চঞ্চল যে তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়েরা করিতে থাকে, তবে সামান্ত জীবে কিরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর পাইবে?" [গিরিশচন্দ্রের 'কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ] তাই কালীকিঙ্কর বলিতেছেন কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব।

তাহা হইলে ত বড়ই বিপদ্। কর্ম্মত্যাগ করা চলে না, আবার কর্ম্ম হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহাও আয়ত্বাধীনে নয়, মানুষ কোন্ পথে চলিবে? মায়াবসানে এই পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা গীতার সেই "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" মহাবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মপ্রবন্ধেও গিরিশচন্দ্র এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন "আমি কর্ত্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমায় কার্য্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্য্য-গরিমা তাঁর, 'আমার' যেন স্বপ্নেও না বলি।" মায়াবসানেরও রঙ্গিণী বলিতেছে "ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, ভগবান্ তুমি জান। প্রভু, যতদিন দেহে প্রাণ আছে, কার্য্যের স্রোত নিবারণ হবে না; কিন্তু হে সর্ব্বমঙ্গলাকর, হে জ্ঞানদাতা, রাজীবপদে অবলার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা আর যেন কার্য্য-গরিমা মনে স্থান না পায়। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, ভালমন্দ তোমার পদে অর্পণ কর্‌লেম।" [৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

মায়াবসানে কর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে প্রকটিত। প্রধান চরিত্র কালীকিঙ্করের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য চরিত্র-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। কালীকিঙ্করের ঠিক্ বিপরীত চরিত্র সাতকড়ি (চাটুয্যে)। পরের উপকার করিয়া কালীকিঙ্করের আনন্দ, পরের সর্ব্বনাশে সাতকড়ির আমোদ। সাতকড়ির মনের ভাব তাহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। "ছেলেবেলায় মাষ্টার গল্প করেছিলেন যে 'কে একজন ফরাসীর পণ্ডিত, রুকো ফুকো (Roche-foucould?) তাঁর মতে পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ। আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝতে পার্‌লেম, জীবনে দুঃখ আছে, প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।" [৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

সাতকড়ি নিজের কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ম পরের অপকার করে না। তাই এটর্ণি কৃষ্ণধন তাহাকে বলিয়াছিল "আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। Mischief for mischief's sake. আপনার জোড়া নেই।" সাতকড়ি যে কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার জন্ম তাহার সর্ব্বনাশ করে, তাহাও নয়। হলধরকে বলে "আমি তোমার পৈতে ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, তুনিয়ার কারুর উপর আমার রাগ নাই, তবে কি জান, একটু আমোদ করা।" কালীকিঙ্কর যখন সাতকড়িকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি মনে কর, যাঁরা পর-উপকার করে তারা আহাম্মক?" সাতকড়ি তখন উত্তর দিয়াছিল, "অমন কথা কি মুখে আনতে পারি? তবে কি জানেন? যার যে সখ্—যার যে সখ্।"

নিজ স্ত্রীর অসুখ, সাতকড়ি ঔষধ আনিতে যাইতেছে। পথে শুনিল, হলধর নালিশ করিতে চায়। অমনি ঔষধ আনা ভুলিয়া গিয়া, নিজের পয়সা খরচ করিয়া হলধরের বাজার করিয়া দিল। যাদব ও মাধবের বিবাদ শুনিয়া উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা যাহাতে মিটিয়া না যায়। কালীকিঙ্করের হস্তে একবার ও হলধরের কৌশলে বিন্দুর গৃহে আর একবার লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই। হলধরকে জাল দলিল করিতে পরামর্শ দিল। নিজে হাজার টাকা খরচ করিয়া পুরাণ ষ্টাম্প কাগজ সংগ্রহ করিয়া দিতে চাহিল। চুপি চুপি অন্নপূর্ণার গৃহ হইতে বাক্স চুরি করিতেও সাতকড়ি পশ্চাৎপদ নয়। একবার যেন তাহার সুমতি উদয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, "আমার ইচ্ছা ভট্‌চায্ যেমন কবুল দিয়েছে, তেম্নি সে কবুল দিই। আমায় ছাড়বে না? না ছাড়ে, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? না হয়, আমায় শুদ্ধ জেলে দেবে।" কিন্তু এ সুমতি নয় —ইহার উদ্দেশ্য উকীলদের সর্ব্বনাশ করা; তাহাদের অপকার হইলে নিজে জেলে যাইতেও কুণ্ঠিত নয়। বলিল "চক্ষের সুখ ত কর্‌বো।

আহা, বেশ হয়, রোজায় ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল।" [৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]

সিদ্ধেশ্বর ও কৃষ্ণধনকে জব্দ করিতে, সাতকড়ি হলধরের সহিত যোগ দিয়াছিল। তাহাদের অভিসন্ধি বিফল হইলে, উচ্চ আদর্শ দেখিয়া বিনু যখন স্তম্ভিত, কৃষ্ণধন, সিদ্ধেশ্বর যখন নিজ নিজ চরিত্র সংশোধনে প্রতিজ্ঞা করিল, সাতকড়ি তখন কেবল বলিল "ছিঃ ছিঃ—আমোদ হ'ল না। আমোদ হ'ল না।" তাহার মনে কালীকিঙ্করের কথা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কৃষ্ণধন, সিদ্ধেশ্বর—মহাপাপী হইয়াও যে মহত্ত্বের আদর্শে মুগ্ধ, সাতকড়ির হৃদয়ে তাহার কোনও প্রভাবই লক্ষিত হয় না। শেষ যখন আমরা সাতকড়ির সাক্ষাৎ পাই, তখন সে কালীকিঙ্করের বাক্স হইতে কাগজ অপহরণে ব্যস্ত। সাতকড়ি-চরিত্রে আমরা পরের অপকার করার প্রবৃত্তি জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। এ অপকারের মধ্যে নিজের কোন স্বার্থ লুক্কায়িত নাই।

মায়াবসানে নারীচরিত্রের মধ্যে রঙ্গিনী প্রধান। রঙ্গিনীর প্রভাব এ নাটকে অসাধারণ। যেখানে অবসাদ—সেইখানেই উত্তেজনা-রূপিনী রঙ্গিনী। যেখানে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের ঘোর গোলযোগ, সেই খানেই জটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ মার্গ নির্দ্ধারণ করিতে আবির্ভূতা রঙ্গিনী, অন্যায়কারীকে তিরস্কার করিতে রঙ্গিনী, সৎকার্য্যে উৎসাহ দিতে রঙ্গিনী, সর্ব্বদা আদর্শ দেখাইতে রঙ্গিনী। বিন্দুর কন্যা রঙ্গিনী কালীকিঙ্কর ও অন্নপূর্ণার স্নেহে বর্দ্ধিত। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ। ঘোর বিপদ ও দারিদ্র্যের মাঝে রঙ্গিনী ও তাহার মাতা বিন্দুবাসিনী কালীকিঙ্করের আশ্রয় পাইল। কালীকিঙ্কর ও অন্নপূর্ণার কৃপায় তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিল। রঙ্গিনীর মনে এই উপকার সর্ব্বদা জাগিয়া রহিল। এইরূপ কৃতজ্ঞ চিত্তে সে কালীকিঙ্করের নিকট বিদ্যা

শিক্ষা করিতে লাগিল। রাসায়নিক্ পরীক্ষা প্রভৃতিতেও সে নিপুণা হইয়া উঠিল। এই ঘনিষ্ঠতায়, তাহার অন্তরস্থিত কৃতজ্ঞতা ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল। এই প্রেম সে কখনও স্পষ্ট জানাই নাই। এ প্রেমে আত্মতৃপ্তির কণামাত্রও নাই। এ প্রেম মঙ্গলময়—অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত। এই প্রেমের অসীম প্রভাবে রঙ্গিনী তেজস্বিনী। কালীকিঙ্করের বিপদে রঙ্গিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবারতা। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে রঙ্গিনীর গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইবে। "আজ ছ বছর সকাল হলেই কতক্ষণে আপনার কাছে পড়তে আস্‌বো, কতক্ষণে আপনাকে দেখবো, এই আমার চিন্তা। যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আমার মনে হয় কারাগারে যাচ্ছি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, সূর্য্যদেব শীঘ্র উদয় হও, দিন হলে আমি পড়তে যাব" [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক] ছোট বাবু তুমি মরো না, আমি কোথায় যাব, আমি কোথায় দাঁড়াব * * আমি তোমায় না দেখতে পেলে বাঁচবো না। [১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক] "আমি যদি তোমার কেউ না হই, তা হলে আমার সব শূন্য। সংসার শূন্য, জীবন শূন্য, প্রাণ শূন্য। [২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক] ম্যাজিষ্ট্রেটকে রঙ্গিনী বলিল, কালীকিঙ্কর "আমার গুরু, ইষ্টদেবতা"। দৃঢ়বিশ্বাসে বলিল "আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি। * * আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নেই।" [৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক] মেমসাহেব বুঝিয়াছিলেন, রঙ্গিনীর প্রেম কত গভীর। তাই নিজ স্বামীকে অনুরোধ করিলেন "Dear, grant her prayer. Love will ever madness." শেষে কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিনী জগতের হিতে নিয়োজিত হইলে এই ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। সেই খানেই উভয়ের মিলন। সংসারের সাধারণ মিলন এ মহান্ প্রেমের উপযুক্ত নয়।

রঙ্গিনী তেজস্বিনী। ধর্ম্মপথে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। শত বাধা বিপত্তিতেও সে বিশ্বাস একটুও টলে না। হলধর যখন বলিল “কি কর্‌বো, এ যে বিপদ সাগর, আমি কি কর্‌বো ?” রঙ্গিনী তখন দৃঢ়স্বরে বলিল “ভাবছি আমি স্ত্রীলোক * * আমার ধর্ম্ম বল, সত্য বল, কৃতজ্ঞতা বল, আমার ইষ্টসেবা, মাতৃ সেবা বল, এ সামান্য বিপদ্‌কে ভয় করি না। আমার অন্তরে ভগবান বল্‌ছেন, কৃতজ্ঞতাবলে সুমেরু হেলে যাবে, সাগর জলহীন হবে, তুমি বল্‌ছো বিপদসাগর, আমি গোষ্পদ জ্ঞান করছি।” [২য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক] এই মনের বলে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জামিন হইতে গিয়াছিল। তাহার অর্থ নাই, স্থূল সম্পত্তি নাই, বলিল, “আমার একমাত্র সম্পত্তি সত্য। আমি আজীবন কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই।” এই সত্যের জামিন দিতে চাহিল। অন্নপূর্ণা বিপদে পতিত, তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্যই রঙ্গিনী এত কাণ্ড করিতেছে। বিপদে সে দিশাহারা হয় না। অন্নপূর্ণার বিপদ্ কাটিয়া গেল কিন্তু কুচক্রীর কৌশলে তাঁহার কলঙ্ক রটিল। তখনও সান্ত্বনা দিতে, যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করিতে রঙ্গিনী ব্যস্ত। রঙ্গিনী বুঝাইল “কেউ কখন কলঙ্কের ভয় করে সত্যের উপাসনা কর্‌তে পারে নি, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারে নি। মা, কলঙ্কের ভয়ে কুলবধূর আচার ত্যাগ করো না।” কিন্তু অন্নপূর্ণা এ কথা শুনিলেন না। তাই মায়াবসানের শেষে সেই গভীর শোকোদ্দীপক অন্নপূর্ণার মৃত্যু দৃশ্য।

হলধর যখন সাতকড়িকে কৌশলে বিপন্ন করিয়াছিল, রঙ্গিনী তখন স্পষ্টই জানাইয়াছিল “তুমি কারুর সাজা দেবার কর্ত্তা নও।” অন্নপূর্ণা রঙ্গিনীর কথা মানেন নাই, হলধরও রঙ্গিনীর কথায় কর্ণপাত করে নাই। পরে এই হলধর আবার উকীলদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাদের জব্দ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। অন্নপূর্ণা ও হলধরকে

সুপথ নির্দ্দেশ করিলেও তাহারা সে পথ অনুসরণ করে নাই, কিন্তু কালীকিঙ্কর রঙ্গিনীর উপদেশে ও অনুরোধে সর্ব্বদাই পরিচালিত হইয়াছিলেন, কালীকিঙ্কর পাগল হইয়া জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রঙ্গিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল "যদি ছোট বাবুকে ভাল করতে পারি, তবেই অন্নজল মুখে দেব।" কিরূপ উপায়ে সে কালীকিঙ্করকে প্রকৃতিস্থ করিল, তাহা নিপুণভাবে আলোচনীয় [৩য় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য] কালীকিঙ্কর যখন বলে "পরোপকারে আমার কি লাভ ?" রঙ্গিনী তখন বুঝায়, পরোপকার করিতে লাভালাভের হিসাব করিতে নাই। কালীকিঙ্কর যখন ক্রোধ পরবশ হইয়া যাদব মাধবকে দূর করিয়া দিল, রঙ্গিনী তখন আসিয়া জানাইল, মার্জ্জনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হতাশ হইয়া কালীকিঙ্কর যখন সংসারের সকল বিষয়ে উদাসীন, রঙ্গিনী তখন নব উত্তেজনামন্ত্রে কালীকিঙ্করের হৃদয় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। রঙ্গিনীচরিত্র এই বিভিন্ন ভাবসমূহ প্রকটিত করিতেছে। তাহার কালীকিঙ্করের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও অপরিসীম অনুরাগ, বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস, রমণী হইয়াও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে সর্ব্বকার্য্যে সফলতা ও তাহার উচ্চ আদর্শ গৌরবমণ্ডিত এক রমণীমূর্ত্তি আমাদের নয়নসমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই মূর্ত্তি বিপন্নকে রক্ষা করে, অবসন্নকে উৎসাহ দেয়, সকল সময়ে ধর্ম্মপথ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সকলকে জানাইয়া দেয়। রঙ্গিনীর প্রভাব গণককারকে মহাপাপ হইতে মুক্ত করিল। রঙ্গিনীর আদর্শে গণককার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্ত হইল।

অন্নপূর্ণা সরল-হৃদয়া। তাঁহার আধুনিক কালের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সমূহকে তিনি সন্দিগ্ধভাবে দেখেন। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে ভাবেন "আইবুড়ো মানুষ, কিছু ত দৃষ্টি ফিষ্টি লাগে নি ?" হলধরের ভূতগ্রস্ত

হওয়ার ভান ও গণককারের প্রতারণা অন্নপূর্ণা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। সেকালের সরলতা, বিশ্বাস ও জ্ঞান থাকাতে অন্নপূর্ণা একালের কুচক্রীদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। ঔষধ বলিয়া তিনি কালীকিঙ্করকে বিষ দিলেন। পরে তাহার ফল দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত। সাতকড়ি প্রাণভয়ে লুকাইতে চাহিলে, অন্নপূর্ণা নিজগৃহে তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। সরলপ্রাণা এ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে ভাবিয়াই উঠিতে পারিলেন না। এই কার্য্য হইতে দুর্জ্জনে তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিল। যাদব মাধব বিষদানের অছিলায় অন্নপূর্ণার নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য শান্তিরামের পলায়নের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, অন্নপূর্ণা ধরা দিতে চাহিলেন। ইন্‌স্পেক্টর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবিমুখ, অন্নপূর্ণা তাহাকে কর্ত্তব্য-সাধনে পরামর্শ দিলেন। এই বিপদে তিনি যে ধৈর্য্য ও সাহস দেখাইলেন, তাহা আমরা তাঁহার কোমলপ্রকৃতি হইতে আশা করিতে পারি নাই। কিন্তু কলঙ্ক রটনার কথা শুনিয়া তাঁহার মন আর স্থির হইল না। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া চলিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র ধ্যান স্বামী! তিনি বলিলেন "আমার স্বামী নাই, তত্রাচ আমার বল্‌বার জিনিষ আছে, আমার গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর। আমার আমার করেই দিন কাটাচ্ছি, তাঁর ধ্যান তো করি নাই।" এই মহান্ উদ্দেশ্যে পতিধ্যান-ব্রত অবলম্বন করিয়া অন্নপূর্ণা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। সংসারের মায়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সে মায়ার অবসান হইল। সরল-প্রাণা কুটিল সংসারে থাকিতে পারিলেন না। যেখানে সরলতার রাজ্য, সরলা "প্রফুল্লের" মত এ সংসার ছাড়িয়া সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

মন্দাকিনী ও নিস্তারিণী চরিত্রে প্রধান দ্রষ্টব্য তাহাদের স্বামী-ভক্তি। তাহারা কুলবধূ! স্বামীর শত অনুরোধেও বিবি সাজিয়া

গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে রাজী হয় নাই। কিন্তু যাদব ও মাধব যখন পুলিশের হস্তে ধৃত, তখন অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ তাহারা পথে আসিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটকে মিনতি করিতেছিল। যাদব ও মাধব যখন অন্নপূর্ণার অনুসন্ধানরত, বালকবেশে উভয় রমণী নিজ নিজ স্বামীর সেবা করিয়া পথে পথে ফিরিতেছিল। যাদব ও মাধব এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া "যদি ত্যাগ করেন" মন্দাকিনী বলিল "তাহ'লে প্রাণত্যাগ করবো। মনে মনে জান্‌বো স্বামী সুখে আছেন। আমরা মলেম বা, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের মত কত লোক ওঁদের পদসেবা করবে!" এই হিন্দুরমণীর আদর্শ। আত্মত্যাগ ও অনুরাগের ইহা সমুজ্জল দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বিশ্বস্ত ভৃত্য শান্তিরাম ও গণককার উল্লেখ-যোগ্য। গণককারের প্রভাব আগে এ দেশে খুবই ছিল। গিরিশচন্দ্রের একাধিক নাটকে এই গণককারের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু বধ, কমলে কামিনী, মায়াবসানে এই গণককার চরিত্র আছে। শাস্তি কি শান্তির গ্রহাচার্য্যও এই গণক-কারেরই রূপান্তর মাত্র। বিষবিক্রয়, প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন গণককারের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু রঙ্গিনীর প্রভাবে তাহার কলুষিত হৃদয় নির্ম্মল হইল। শেষে প্রায়শ্চিত্ত,—বিষপানে তাহার আত্মহত্যা।

মায়াবসানে মায়ার বন্ধনমোচন প্রদর্শিত হইয়াছে। কালীকিঙ্কর ফল-কামনার সহিত কার্য্য করিতেন, পরে এই ফলকামনা বিসর্জ্জন দিলেন। অন্নপূর্ণা বিধবা, স্বামীকে ভুলিয়া পার্থিব বন্ধুনিচয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে এ আকর্ষণ দূর হইল। যাদব, মাধব রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিতেন, পরে নিজেদের চরিত্রের দীনতা বুঝিতে পারিলেন। এটর্ণি, ডাক্তার ও গণককার মহাপাপী—পরে তাহাদের জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ চরিত্রের ক্রমোৎকর্ষ ও বিকাশ মায়াবসানে প্রকটিত।

সামাজিক নাটকে অতি সাবধানে গীতের সন্নিবেশ করিতে হয়। নহিলে অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। মায়াবসানে দুইটি মাত্র গীত। একটি বিন্দু কর্ত্তৃক গীত। অন্নপূর্ণা মৃত্যুশয্যায় রাধার বংশীরব শ্রবণে উৎকণ্ঠা-সূচক গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। বাঁশী যেমন রাধাকে ডাকিত, তেমনি অন্নপূর্ণার স্বামীও অন্নপূর্ণাকে পরলোক লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, অন্নপূর্ণাকে ডাকিতেছেন। এই সঙ্গীতটির সার্থকতা এইরূপে প্রতিপন্ন হইবে। আর সর্ব্বশেষে রঙ্গিনীর সঙ্গীতটি মায়ার অবসান দ্যোতক।

"মেদিনী মিশিল তরল সলিলে, তখন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল বিপুল ব্যোমচারী॥
নীরব রব শূন্য শরীরে শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে মায়াকায়াহারী॥"

এই সঙ্গীত কালীকিঙ্করের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। "মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্ব্বাপিত হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্ত্তন, জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ কল্পনা করা যায় না।" সঙ্গীতে এই ভাবেরই বিকাশ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূত একে অপরের মধ্যে মিশাইবে। পৃথিবী সলিলে ডুবিবে, তেজময় তপন সলিল শুষ্ক করিবে। সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইলে কেবল পবন বহিবে। শেষে তাহাও থাকিবে না। অনন্ত ব্যোম সবব্যাপিয়া বর্ত্তমান। মায়ার বিরাট প্রসার এই পঞ্চ ভূত শেষে ধ্বংস হইয়া যাইবে। মায়ার দুর্ভেদ্য তিমির ভেদ করিয়া চৈতন্যের সমুজ্জ্বল আলোক ফুটিয়া উঠিবে, দর্শনের প্রতিপাদ্য মায়ার বন্ধন দূর হইতেই নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ। এই মহা-বাণীর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মায়াবসানের যবনিকা পড়িয়াছে।

* * * * *

প্রফুল্ল-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম,এ

সৃষ্টিকারের শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষের মনে ভাবিবার, জানিবার, এবং প্রকাশ করিবার একটি চিরন্তন ব্যাকুলতা ও ঔৎসুক্য প্রকটিত রহিয়াছে। এই চিরন্তন সত্যটীর পিছনে যে জিনিষটী বর্ত্তমান, তাহা হইতেছে সাহিত্য সৃষ্টি। আমাদের স্মৃতির গবাক্ষ পথে যদি একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিব যে সেই অম্লান বৈদিক যুগের মধ্য দিয়া রামায়ণ মহাভারতের যুগ অতিক্রম করিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যের মাধবী-নিকুঞ্জে বসন্ত-বিলাসের রমণীয় লীলা উপভোগ করিয়া এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পিছনে ফেলিয়া আমরা এই বিংশ-শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মণি-কাঞ্চন-মিলন যুগে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা যদি পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিব যে আমাদের সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাই তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। সাহিত্যই আমাদের সেই ফেলে-আসা-পথের এক একটি 'মাইলষ্টোন'। বর্ত্তমান সমাজ-মনের গতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিরও দিক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং তাহার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ও হইতেছে।

সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের সমস্ত দিকগুলিই বুঝায়, যেমন কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের নাটক দিকটাই আলোচিত হইবে। এই নাটক দৃষ্ট হয় সংস্কৃত যুগ হইতে। সংস্কৃত যুগে নাটক রচনা করিবার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ ছিল এবং তাহারই পূর্ণ অনুসরণ করিয়া নাটক রচিত হইত। ঐ যুগের নাটকের বিষয়বস্তু কি হইবে তাহাও সেই নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নাটক রচনা করিবার সময়ে সেই প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসৃত হয় না, বরং ঐ রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষণা করিয়া বর্ত্তমান নাটক-রচনা-পদ্ধতি ভিন্ন পথে চলিয়াছে এবং এই চলার পিছনে আছে সমাজের বিবর্ত্তন।

নাটক কাহাকে বলে যদি এ-কথার বিচার করিতে যাই তাহা হইলে বলিতে হইবে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমাজ-জীবনকে প্রকাশ করা। অনেকে বলিবেন যদি নাটকের ইহাই সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে উপন্যাসেরও এই সংজ্ঞা হইবে। কিন্তু উপন্যাস ও নাটকে তফাৎ হইতেছে এই যে, উপন্যাসে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে; তিনি সাহিত্যিক চরিত্রের দ্বারা অনেককিছু না বলাইয়া নিজে পাঠককে সেই সব বলিয়া দেন, কিন্তু নাটকে লেখক কিছুই বলেন না।* যাহা বলিবার, যাহা করিবার সমস্তই চরিত্রের বাচনে ও কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করেন; আর একটী তফাৎ হইতেছে এই যে, উপন্যাসে বর্ণনার বাহুল্য থাকে। কিন্তু নাটকে বর্ণনার বাহুল্যত নাই-ই, যদিও থাকে তাহা অতি সামান্য এবং নাটকীয় চরিত্রেরই কথার দ্বারা বিবৃত। নাটক ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্য শ্রব্য কাব্য এবং নাটক দৃশ্য কাব্য। যাহা দেখিবার, যাহা দেখিয়া উপলব্ধি করিবার, তাহাই দৃশ্যকাব্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশে পাশে যে-সমস্ত নরনারী ভিড় করিতেছে, তাহাদের জীবন-ধারা আমরা যেমন দেখিতেছি ঠিক তেমনিই আমরা তাহাদের জীবন যাত্রা সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদেরই কথা-বার্ত্তায় জানিতে চাই। আমার পার্শ্ববর্ত্তী নরনারীর জীবনধারা আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি, তাহা যেমন, কাহারও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও তাহাদের জীবন-যাত্রার পূর্ণ অভিব্যক্তি আমার স্বচক্ষে দেখা চাই; কাহারও medium চাই না। শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে; তাই নাটকের চাহিদা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাপ্রশাখা অপেক্ষা বেশী।

* এই গ্রন্থে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্রের 'নাট্যকার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—নাঃ ভাঃ সম্পাদক

সাহিত্য যেরূপ দুই প্রকারের—objective এবং subjective, নাটকও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; objective ও subjective। objective নাটক রোমাণ্টিক; সমাজ-মনের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই, কিন্তু subjective নাটক—সামাজিক এবং সাধারণ ব্যক্তিস্থানিক। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে—নাটক সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে সৃষ্টি হইয়াছিল objective বা Romantic নাটকের। তখন subjective বা social নাটকের উদ্ভব হয়নি। Romantic নাটকের বিষয়বস্তু দেখি—কোন রাজার বা কোন বীরের বা সমাজের কোন উচ্চশ্রেণীর মানবের জীবন কাহিনী; যাহার সহিত সমাজের সাধারণ লোকদিগের সংস্পর্শ খুবই কম। রাজার সহিত সাধারণের সম্বন্ধ প্রজারূপে, দেশের সহিত বীরের সম্বন্ধ শান্তিরক্ষক রূপে. সমাজের সহিত সমাজনেতার সম্বন্ধ সংস্কারকরূপে। তাই সাধারণ ইহাদের এটুকু পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইত না, তাহাদের জীবনের আরও কিছু পরিচয় জানিতে উৎসুক হইত। তাই, ঐসব অসাধারণ মানবকে নাটকে প্রতিফলিত করা হইত। কিন্তু সামাজিক নাটক তখন রচিত হইত না কেন? বোধ হয় এইজন্যই যে, সে-যুগের সমাজে এত জটিলতা এবং বিপ্লব উপস্থিত হয়নি এবং সমাজের সহিত সাধারণের সংঘাতও দেখা দেয়নি। তাহারা সেই যুগের তদানীন্তন সমাজ নিয়েই সুখী ছিল। কিন্তু সে সমাজ আজ আর নাই। ক্রমবিকাশের পথে সমাজ বর্ত্তমান যুগের এমন এক সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে যেখানে তাহা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, সমাজ-মনের সহিত ব্যক্তি-মনের সংঘাত হইতেছে এবং আন্তর্জ্জাতিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিলনে—মনস্তত্ত্ব এবং যান্ত্রিক সভ্যতার বিবর্ত্তনে প্রত্যেক দেশের সমাজ আবর্ত্তিত হইতেছে। তাই বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে সামাজিক নাটক রচনা সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশেও সামাজিক নাটক রচিত হইতেছে।

সামাজিক নাটক এবং রোমান্টিক নাটকের নির্ম্মিতি বা Technique সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সামাজিক নাটকে আমরা দেখিতে চাই সমাজ-মনের সহিত ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব, সাধারণ মানবসমাজের পূর্ণরূপ—যেখানে বাস্তবতা কিছু নাই, সাধারণ নরনারীর দ্বারা সাধারণ বাচনভঙ্গী এবং হাবভাবের সাহায্যে বাস্তব জীবনের পূর্ণ পরিচয়। সামাজিক নাটকে অবাস্তবতা কিছু আসিলেই সাধারণের অসন্তোষ উদ্রেক করে এবং তাহারা আর দেখিতে চায় না। কারণ অবাস্তবতা সেইখানেই সম্ভব, যেখানে সাধারণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু যাহা জ্ঞাত, যাহা পরিচিত এবং যাহা বাস্তব তাহা যদি অপ্রাকৃতের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় তাহা হইলে তাহা যে বিসদৃশ ব্যাপার হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রোমান্টিক নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে এবং তাহাদের বাচনভঙ্গী, চালচলন এবং হাবভাব যদি বাস্তবতার ক্রটী পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য হই, কারণ আমরা উহার সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না। সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' বা কালীদাসের 'দুষ্মন্ত' কিভাবে কথা কহিতেন, এবং তাঁহাদের জীবনধারা কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না, তাই উক্ত চরিত্রদ্বয়ের কোথাও যদি ক্রটী দেখি, তাহা আমরা আমাদের অজ্ঞতাবশঃতই গ্রহণ করি; কিন্তু যদি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ এবং রমেশ চরিত্রে কোন অবাস্তবতা লক্ষ্য করি তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করি এবং তাহা আমরা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি না। ইহাই হইল রোমান্টিক এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে প্রভেদ এবং উহাদের বিচারের মাপ কাঠি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক সামাজিক, কি গার্হস্থ্য সে বিষয় বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে সামাজিক বলা যাইতে পারে যদি 'সামাজিক' শব্দ বৃহত্তর অর্থে প্রযুক্ত হয়। মানুষ

সামাজিক জীব। সেই মানুষ যদি নাটকে চিত্রিত হয় তাহা হইলে তাহাই সামাজিক নাটক হইবে, এরূপ অর্থে সমস্ত নাটকই সামাজিক হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়। সামাজিক নাটক সেইখানিই শুধু বিবেচিত হইবে, যে-খানিতে থাকিবে সমাজ-মনের সহিত ব্যক্তি-মনের সংঘাত এবং যেখানে সমাজ সেই নাটকীয় চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহা ব্যতীত কোন নাটক সামাজিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রফুল্ল নাটকে সমাজের সম্পর্ক বিন্দুমাত্রও নাই, সমাজের প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হয় নাই। ইহাতে শুধু একটী সংসারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে একটা শান্তিপূর্ণ, সচ্ছল, এবং সুসজ্জিত সংসার একটা কুলাঙ্গার, লোভী, এবং স্বার্থপর ভাইয়ের দ্বারা ধ্বংসে পরিণত হইয়াছিল। তাহাই নাটকের বিষয় বস্তু। অতএব ইহাকে সামাজিক না বলিয়া গার্হস্থ্য নাটক বলাই শ্রেয়ঃ।

প্রফুল্ল নাটকের যদি গুণাবলীর বিচার করিতে যাই তাহাহইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে ইহার 'প্রফুল্ল' নামের সার্থকতা। নাটকে যে চরিত্রের অধিক কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়, যাহার উত্থান-পতনে পাঠকের মনে রেখা পতিত হয়, যাহার কর্ম্মে ও ত্যাগে অন্যান্য চরিত্রের উপর Poetic Justice প্রতিফলিত হয়, তাহার নামেই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত। 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহাই হইয়াছে। যোগেশ আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শুধু মদেই অচেতন হইয়া রহিল, তাহার চিরপতন হইল। জ্ঞানদা প্রতিপ্রাণা সাধ্বীর মত বিশেষত্বহীন, সে স্বামীর অনুগামিনী। রমেশ যে অধঃপতিতের চিত্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহার এই অধঃপতন হইতে আর উত্থান হইল না। সুরেশ এমন একটা চরিত্র, যাহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না; তাহা হইলেও তাহার উত্থান আছে—যদিও সেই উত্থান নাটকের পরিণতির বিশেষ সহায়ক হয়নি। প্রফুল্লের কর্ম্মে সে কিছু সাহায্য করিয়াছে মাত্র। প্রফুল্লের মনে সংস্কার

ও বিদ্রোহের সংঘাত দেখি এবং তাহারই আত্মদানে এবং তাহারই কর্ত্তব্যে নাটকের পরিণতি বেশ সুসমঞ্জস্য হইয়াছে বলিতে হইবে। Poetic Justice চরিত্রগুলির উপর প্রতিফলিত হইয়াছে।

যখন যোগেশ মদে অচেতন এবং পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, জ্ঞানদা পথে ভিখারিণীর মতই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সুরেশ বন্ধুগৃহে অবস্থান করিতেছে, রমেশ পৈশাচিক বৃত্তির অনুসরণ করিতেছে এবং উমাসুন্দরী পাগলের প্রলাপ বকিতেছে, তখন প্রফুল্ল একা সংসারে অবস্থান করিয়া এবং নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চরম পরিণতি আনিয়া দিল। নাটকে উক্ত চরিত্রগুলির নাটকে যতটুকু প্রভাব বা শক্তি দেখা গিয়াছে তাহা অপেক্ষা প্রফুল্লর প্রভাব অনেকাংশে পরিস্ফুট। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাম যথোপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চন্দ্রগুপ্তের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নাটকে প্রতিফলিত হয় নাই, সে শুধু চাণক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, চাণক্য তাহাকে যে দিকে ফিরাইয়াছে, সে সেই দিকেই ফিরিয়াছে; চাণক্য যন্ত্রী, সে যন্ত্র। চন্দ্রগুপ্তের অস্তিত্ব পৃথক্‌রূপে কিছু নাই, তাহার অস্তিত্ব চাণক্যের সহিত জড়িত। কিন্তু প্রফুল্লর ব্যক্তিত্ব আছে, নিজের স্বকীয়তা আছে, সে মদন পাগলাকে সত্যের সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে, যাদবকে নিজ আত্মবলিদানে বাঁচাইয়াছে এবং দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেওয়াইয়াছে। প্রফুল্ল চরিত্রই নাটকে poetic Justice নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই সকল কারণে 'প্রফুল্ল' নামের সার্থকতা হইয়াছে। আমরা হেমেন দাশগুপ্ত রচিত 'গিরিশ-প্রতিভা' হইতে 'প্রফুল্ল নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পারি।

"প্রফুল্ল নাট্যকারের অদ্ভুত সৃষ্টি। ভীমকান্ত গুণের কথা যদি নারী চরিত্রে প্রয়োগ করা অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে বলিব প্রফুল্ল ভীমকান্ত গুণোপেতা,—স্বভাবতঃ মৃদুশীলা। কিন্তু প্রয়োজন মত আবার তেজস্বিনী। যেমন স্বামীগত প্রাণা, স্বামীর নিন্দা শুনিতে অসমর্থ,

তেমনি আবার স্বামীর অন্যায়াচরণে খড়্গপাণি। সেকেলে মেয়ের মত যেমন মনে করে 'পতি পরম গুরু' তেমনি একেলে মেয়ের মত মিথ্যাবাদী স্বামীকে মুখের উপর বলে "মিথ্যাকথা ব'লতে পারবো না।" এরূপ গুণবৃত্তির বিসম্বাদের সমাধানে প্রফুল্লচরিত্র বৈচিত্র্যময়। তাই 'প্রফুল্ল' নামই নাটকের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।"

১৮৮৪ খ্রীঃ গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত মিলিত হন এবং এই সংযোগ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে এবং নাট্যকার জীবনে এক নূতন আলোকপাত করে। এই সময় তিনি 'চৈতন্যলীলা' প্রণয়ন করেন এবং সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে 'প্রফুল্ল' নাটক রচনা করেন। অতএব 'প্রফুল্ল'র মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু ছাপ পড়া স্বাভাবিক। যেমন এই অংশগুলি উহার সাক্ষ্য দিবে: "মিছে কথা কইলে নরকে যায়''। "ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গ, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও'। "সুনাম রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক শোভা পায়"। "বিশ্বাস ব্যবসার মূল।" এই যে কথাগুলি কথিত হইয়াছে, ইহারা গিরিশচন্দ্রের নৈতিক আদর্শের পরিচয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অতএব এই নৈতিক আদর্শও প্রফুল্ল'র একটী গুণ বলিতে হইবে। 'প্রফুল্ল' লিখিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের তুলনায় 'প্রফুল্ল' যে তৎকালে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাহাও প্রফুল্ল'র একটী গুণ বলিতে হইবে।

'প্রফুল্ল'র মধ্যে Realistic touch আছে। যে সমস্ত সংলাপ বা কথাবার্ত্তা চরিত্রগুলির দ্বারা উক্ত হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই অতি বাস্তব। চরিত্রগুলির দ্বারা যখন যে কথা বলান উচিত, গিরিশচন্দ্র তখন সেই কথাই বলাইয়াছেন। কোন চরিত্রের মুখ দিয়া তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক কোন কথা বলা গিরিশ-সাহিত্যে অতি না হইলেও প্রায় বিরল। জেলের মধ্যে রমেশের প্রতি সুরেশের যে তীব্র বাক্যবাণ তাহা

অতীব বাস্তব এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। "তোমার জেল হয় না কেন জান? আজও তোমার যোগ্যতর জেল ত'য়ের হয় নি।" গিরিশ সাহিত্যে চরিত্রের মধ্য দিয়া যে emotion ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতি বাড়াবাড়ি হইলেও আমাদের হৃদয় সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে অভিভূতি হয় এবং এই অতি আধুনিক বিংশশতাব্দীতে, যখন কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কি নীতিতে মানুষের standardএর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন ঐ emotion যে এখনও আমাদের আনন্দ দিতেছে তাহা গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বের এবং 'প্রফুল্ল'র কম উৎকর্ষতার পরিচয় নয়! 'প্রফুল্ল'র মধ্যে পুরুষ চরিত্রগুলি অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলি অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে এবং ইহাদের স্বাভাবিকত্ব কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন হয় নাই। উমাসুন্দরী, প্রফুল্ল এবং জ্ঞানদার কার্য্যকলাপ এবং স্নেহ, প্রীতি, এবং ভালোবাসা, কোথাও বাস্তবকে ছাড়াইয়া যায় নাই। "গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক নানা বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন—উচ্চ, নীচ, পাপী, পুণ্যবান, কর্ম্মী, নিষ্কর্ম্মা, উপকারী, অপকারী, আততায়ী ও রক্ষক প্রভৃতির চরিত্রের আলোকছায়ার সংমিশ্রণ এবং নানারূপ অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি ও পুষ্টি।" গিরিশ্চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রফুল্ল'র সম্বন্ধে এই উক্তি যথাযথ উক্ত হইতে পারে এবং ঐ উক্তির সার্থকতা প্রফুল্ল নাটকের মধ্যে বর্ত্তমান।

পাশ্চাত্য Tragedyর যে সমস্ত লক্ষণ তাহা পূর্ণভাবেই 'প্রফুল্ল'র মধ্যে বর্ত্তমান এবং তাহাতে যে রসসৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই করুণ রসের কতখানি স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক তাহা চিরন্তন সাহিত্যের কষ্টিপাথরে অবশ্যই বিচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

প্রফুল্ল একখানা Tragedy। Tragedy অনেক রকমের আছে; যেমন

romantic tragedy, social tragedy, domastic tragedy, গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়ারের Tragedy'র অনুকরণ করিয়াও কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়াছেন ; কারণ সেক্সপীয়ার রোমান্টিক ট্রেজিডি লিখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সামাজিক Tragedy লিখিতে গিয়া রোমান্টিক ট্রেজিডির Technique অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে Technique ঠিক আছে কিন্তু বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। romantic এর জায়গায় social আসিয়াছে। অতএব এইখানেই গিরিশচন্দ্রের এই 'প্রফুল্ল' লেখার Tragedy রোমান্টিক ট্রাজেডির নায়ক নায়িকার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব hazy, তারা সারস্বত সত্য, প্রাকৃত সত্য নয়। কিন্তু social কিংবা domestic tragedyর নায়ক নায়িকাদের আমরা ঘরের লোক বলিয়া জানি, তাই তারা যদি ঐ Romantic Tragedy'রমত হয় তাহা হইলে ঐ Social বা domestic Tragedy নির্ম্মাণ স্থলে একখানি Tragedy।

Domestic Tragedy মূর্ত্তি পায় তখনই, যখনই মনের সঙ্গে মনের বিচ্ছেদ বা অঘটন-বিঘটন হয়। রক্তারক্তি বা খুনোখুনিতে domestic tragedy হয় না। প্রফুল্ল Tragedy হইয়াছে সেইখানে, যেখানে মা ছেলের কথা শুনিয়া বাড়ী বেনামী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তারপর ঐসব বিষাদময় মৃত্যু—Tragedyর বাড়াবাড়ি হইয়াছে। ইহা যেন শুষ্কবৃক্ষের পাতা ঝরান হইয়াছে, শবের ভস্মস্তূপ লইয়া দিগ্বিদিক বিকীর্ণ করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র Shakespeareএর Technique লইয়া মস্ত বড় ভুল করিয়াছিলেন। তিনি যদি Ibsenএর Technique লইতেন (যেমন Doll's house প্রভৃতি) 'তা হ'লেও বরং ভাল করিতেন, কিন্তু তা যদি না লইলেন তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিলেন না কেন ? Shakespeare এর রচনারীতি ও Technique হইতেছ এই—

"Shakespeare has elevated the whole conception of plot from that of a mere unity of action obtained by reduction of the amount of matter Presented, to that of a harmony of design, binding together to concurrent action from which no degree of complexity was excluded."

"Shakespeare gives us many murders, but it is surely a significant fact, that the most terrible of all, that of Duncan in 'Macbeth' takes place off the stage."

Social নাটকে গিরিশচন্দ্র এই Technique লইয়াই সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক রচনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এইবার চরিত্র বিশ্লেষণের কথা। চরিত্র বিশ্লেষণের পুর্ব্বে চরিত্র নির্ম্মিতি কিরূপ হইয়াছে দেখা দরকার। কেননা নাটকে চরিত্র নির্ম্মিতিই সবচেয়ে বড় কথা এবং রচনার সাফল্যের একটী মস্ত বড় দিক।

"Characterisation to the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic works. It is only because the core of Macbeth is not the murders which Macbeth commits, but the character of Macbeth himself, that Macbeth is a stupendous tragedy and not a mere forago of sensational horrors."

যোগেশের characterএ defect হইতেছে এই যে, সে আগাগোড়া simple; Hero-like characteristics তাহার চরিত্রে নাই। প্রথম হইতেই দেখি যে, সে কখনও ভাবিতে শেখে নাই, একেবারেই যেন ক্ষণ ভঙ্গুর। একটা exaggeration of self এই চরিত্রে বর্ত্তমান। প্রধান চরিত্র যোগেশ মদে অচেতন হইয়া আছে। এই অবচেতনে যে slip করে তাহার slip তত বড় নয়; যত বড় হয় সেই slip, যাহা

conscious stateএ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে শুনিয়া যোগেশের মদ খাওয়া একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। সে কি একটুও ভাবিবার, বিবেচনা করিবার, পরামর্শ করিবার সময় পাইল না? যে ব্যক্তি নিজ কর্ম্মশক্তিতে এতবড় হইয়াছিল, তাহার এই সামান্ত ধাক্কায় এরূপ বিভ্রান্ত হওয়া কি স্বাভাবিক? গোড়ায় পড়িতেই এই প্রশ্ন জাগে। মদ খাওয়ার যৌক্তিকতা দেখিতে পাই উমাসুন্দরীর কথায় "আমার ধর্ম্মভীরু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'লবে এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে, আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া।" কিন্তু এই অভিমান যোগেশের পক্ষে করা উচিত কিনা, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে, পুনরায় গঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা দেখা উচিত ছিল। তদারক করিয়া তাহার টাকা কিছু পরিমাণে উদ্ধার করা যায় কিনা দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যোগেশ এসব দিক দিয়াও একবার যাইল না। পীতাম্বরের "বাবু বাবু" ব্যস্ত হবেন না আবার সব হবে।" এই কথা সত্ত্বেও যোগেশ একবার তাহার সহিত পরামর্শও করিল না। Sudden shockএ মানুষ মারা যাইতে পারে সে তবু ভাল, কিন্তু নিজের শোক ভুলিবার জন্য এই মদ খাওয়া যে অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত—এবিষয়ে আমাদের সন্দিগ্ধ মন সাড়া দিয়া উঠে।

রমেশ চরিত্রের গঠনের পূর্ব্বে কোন সঙ্গতি বা Preparation নেই। সে যে এতই নরাধম, দুর্ব্বৃত্ত এবং লোভী কি রূপে হইল তাহার সম্বন্ধে জানিবার আমাদের কোন অবকাশ দেওয়া হয় নাই। এই চরিত্রের গোড়ায় কোন Preparation নেই, থাকিলে অনেকটা স্বাভাবিক হইত, কিন্তু তাহা না থাকায় অস্বাভাবিক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' এ শান্তির চরিত্র চিত্রনে অনেক Preparation ক'রিয়াছেন। তাকে গোড়া হইতে পুরুষের সহিত মিশিতে, খেলিতে,

পড়িতে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তবে সে পরে সন্তানদিগের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে বা ইংরাজ সৈন্যকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে শান্তির অস্বাভাবিকত্বের ছাপ অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু রমেশের মত পুত্র, ঐ রূপ ধর্ম্মের সংসারে—সচ্ছল, আনন্দপূর্ণ সংসারে কি রূপে আসিল, ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার সমাধান করিতে না পারায় চরিত্রের অস্বাভাবিকত্ব থাকিয়া যায়।

Character এ Complexity হয় সেখানেই, যেখানে কোন চরিত্র তাহার কোন বৃত্তির বিষয়ে সচেতন নয়, অথচ সেই বৃত্তিটা অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সুরেশ চরিত্র এই হিসাবে complex নয়। কেন না সুরেশ তাহার চরিত্রের দুটী দিক সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। একটী হইতেছে নিজের অধঃপতনের, আর একটী হইতেছে সংসারের প্রতি ভালোবাসা, প্রীতি এবং দরদ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রমেশের Soliloquy একেবারে বিসদৃশ ব্যাপার। Soliloquy হইবে সেখানে, যেখানে ভাবের উদ্বেলতা। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে খুব Simple ব্যাপার—রমেশের আত্মপ্রসাদ, এতে Soliloquy দরকার হয় না। Shakespeareএর অনুকরণে অস্থানে Soliloquy রচনা।

জীবন ও আর্ট এক নয়। ব্যক্তিগত সত্য আর সাহিত্যিক সত্য এক নয়। জীবনের ব্যাপ্তি অসীম, অনন্ত, তাহার বিকাশের স্থান অনেক। কিন্তু আর্টের চরিত্রের বিকাশের স্থান সেই আর্টের গণ্ডীর বাহিরে নয়, ভিতরে। তাই তার কোন অস্বাভাবিক বৈচিত্র্য আমাদের সহজেই লক্ষ্যে পড়ে। তাই আর্টের চরিত্র হইবে সব দিক দিয়া শোভন। কোন অসামঞ্জস্য তাহার মধ্যে স্থান পাইবে না। রমেশের এই Villanyর পিছনে কোন ইতিহাস বা কোন সঙ্গতি নেই, তাই ইহা

একটা চরিত্রই হয় নাই। রমেশের এই নিষ্ঠুর চরিত্র যেন Shakespeare এর উপর Challange.

কাঙালীকে দেখি, সে তাহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য এক জন পাপিষ্ঠা বেশ্যার সহিত মিশিতেছে। জোচ্চোর, লম্পট, পাপিষ্ঠ কাঙালীর সহিত মিশিতেছে। রমেশ বদমায়েস, লোভী, স্বার্থপর, হিংসুক—এ সকল সবই তাহার উপর প্রযোজ্য, কিন্তু সে এক জন উকীল, লেখাপড়া শিখিয়াছে, পাঁচ জন ভদ্রলোকের সহিত মিশিয়াছে—সে বদমায়েস হইলেও তাহার দুর্ব্বৃত্তির একটা আভিজাত্য আছে, তাহার নিজের একটা ব্যক্তিত্ব আছে; তাহাতে সে কিরূপে ঐ বেশ্যার গৃহে যাইয়া তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল! ইহাতে তাহার নিজের আভিজাত্যের এবং ব্যক্তিত্বের সম্মান ও মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবে ইহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিল না? অনেকে বলিবেন, রমেশ যে চরিত্রের লোক তাহাতে উহাদের সহিত মেশা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমরা বলিব যে, এক জন উকীল একটা বেশ্যার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে—এখন ইহা পড়িতে আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।

তার পর রমেশের প্রফুল্লর সহিত 'তুই' বলিয়া কথা কওয়া আধুনিক রুচি বিগর্হিত। রমেশ ও প্রফুল্লর কথোপকথন দৃশ্যটী আমাদের রুচিতে বাধে। আজ কালকার দিনে কোনও ভদ্র সমাজের লোক, সে অতি দুর্ব্বৃত্ত হলেও স্ত্রীর সহিত 'তুই' বলিয়া কথা বলে না, আর যদিও বলে, তা সে ব্যক্তিগত জীবনে, আর্টের ক্ষেত্রে নয়।

সমস্ত নাটকটীর মধ্যে দেখিতে পাই, রমেশের সহিত প্রফুল্লর দেখা হইয়াছে মাত্র দুইবার। একবার প্রথমে আর একবার শেষে। এই দুইবার মিলনের মধ্যে আর কোথাও কি দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই? ইহা একেবারে অস্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখা করান নাই,

পাছে রমেশ চরিত্রের দুর্ব্বৃত্তির কিছু পরিমাণে হ্রাস হয়, কিন্তু তাহাতে স্বাভাবিকত্ব অপেক্ষা অস্বাভাবিকত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদি প্রফুল্লর মহীয়সী নারীত্বের সংস্পর্শে আসিয়া রমেশ কিছুমাত্র তাহার চরিত্রের সংশোধন করিতে পারিত তাহা হইলে সব দিক দিয়া শোভন হইত, এই রূপ এক টানা একঘেয়ে পৈশাচিক বৃত্তির ইতিহাস পাঠে পাঠকচিত্ত একটু বিরতিলাভ করিত এবং রমেশ চরিত্র স্বাভাবিক হইত।

যদি দেখিতাম রমেশ প্রফুল্লর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই পালায়. প্রফুল্লর প্রশ্নের উত্তরে জবাব না দিয়া চলিয়া যায়, দেখা হইলেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহ গিরিশচন্দ্র দেখান নাই। আমরা রমেশের এক টানা জালিয়াতি, শঠতা, এবং নীচাশয়তার আবহাওয়ায় হাঁপাইয়া উঠি। আমরা একটু বিরতি পাইতে চাই; এবং যদিও তা পাই, হয় সে জ্বালাময় দুঃখের মধ্যে, না হয় পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠা—কাঙালী ও জগমণির অতি কদর্য্য রসালাপ, আর মদন ঘোষের ভাঁড়ামির মধ্যে।

গিরিশচন্দ্র যদি Shakespeare এর Iago চরিত্রের আদর্শেই রমেশ চরিত্র সৃষ্টি করেন, তাহা হইলেও ইহা যে defected সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। Iago তার স্ত্রীর সহিত ঐরূপ অভদ্র ভাবে কথা কহে নাই, বরং অতি ভদ্রভাবেই কথা কহিয়াছিল। আবার যদি নিষ্ঠুরতার দিক দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও দেখি যে Iago ডেসডিমনার সম্মুখে এক বিন্দু চোখের জল ফেলিয়াছিল। যদিও তাহা তাহার অভিনয় হইতে পারে, তথাপি ফেলিয়াছিল ত! কিন্তু রমেশ যাদবের মৃত্যু শয্যায় তাহার আকুল প্রার্থনায় এক বিন্দু জলও তাহার মুখে দেয় নাই। সে জগমণিকে দিতে বলিল, কিন্তু জগমণি দিল না, বলিল "না, না, তবু পাঁচ মিনিট যুজবে।" এই ভীষণ নিষ্ঠুরতা পাঠকের অসহ্য—রমেশ চরিত্রের অস্বাভাবিকত্ব। এমন কোনও পাষণ্ড আছে যে ঐ সময় এক বিন্দু জল না দিয়ে থাকতে

পারে? তার উপর ডাক্তারকে দিয়া বলায় 'একটা ব্লিষ্টার দাও'! গিরিশচন্দ্রের এখানে যেন challange, কে কত বড় নিষ্ঠুরতার ছবি আঁকতে পারে। যাদবের মুখ দিয়া যে সমস্ত কথা বলান হইয়াছে তাহাও ঐটুকু ছেলের পক্ষে অনেকটা অস্বাভাবিক।

সুরেশের আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঐরূপ উচ্ছ্বাস, একেবারে বাস্তবতার বাইরে, artificial। ঐ সময় কাহারও মুখ দিয়া ঐরূপ উচ্ছ্বাস বাহির হয় না, তখন সে হয় নির্ব্বাক, শোকে, দুঃখে, অভিমানে লজ্জায় অভিভূত। তখন তাহার পক্ষে আসামীর জবাবদিহি করিতেও ইচ্ছা হয় না। সে শুধু শাস্তি চায়। সুরেশের "চল জমাদার নিয়ে চল" এই কথাটী এই প্রসঙ্গে খুব সুন্দর হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র অনেক জায়গায় কথাবার্ত্তার মধ্যে Realistic touch দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সব কথা আধুনিক রুচিসম্মত নহে। আমরা তাহা পড়িতে ঘৃণা বোধ করি। জগমণি এক জায়গায় বলিতেছে" কি মকদ্দমাটা আমায় তো এক দিনও বল্লি নি; এর ভলো মন্দ বুঝবো কি ক'রে? মনে করিস আমি মেয়ে মানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের! এই মাই দুটো কাটতে পাত্তেম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি, পোড়া ভগবান যে মেরেছে।" একেবারে বীভৎস, অতি কুৎসিত চিত্র।

মদন ঘোষের ভাঁড়ামিতে হাসি পায় না, যেন জোর করিয়া হাসায়।

গিরিশচন্দ্র একটা জিনিষ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, যদি তা উপেক্ষা না করিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে 'প্রফুল্ল' রচনায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতেন, আমরা এরূপ অংশতঃ অকৃতকার্য্যতার দোষ আরোপ করিতে পারিতাম না। যে জিনিষটী, অর্থাৎ চিন্তাটী উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহা এই—

"The print of modern life is marked by its comprehensiveness and reconciliation of opposites."

গিরিশচন্দ্রের বিয়োগান্ত নাটক 'প্রফুল্ল' সে যুগের প্রশংসা লাভ করিলেও এ যুগে যে ততখানি প্রশংসা লাভ করিতে পারে না, সে বিষয়ে

যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক মত দিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার কারণ হইতেছে এই যে যুগে যুগে মানুষের এবং সমাজের আদর্শের ধারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং 'প্রফুল্ল' নাটকে শাশ্বত সাহিত্য সত্যের অভাব। যদি গিরিশচন্দ্র সে যুগের জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা না করিতেন, যদি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অনাগত সমাজের জন্যও নাটক রচনা করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমরা 'প্রফুল্ল' নাটকে উল্লিখিত অস্বাভাবিকতার দোষ আরোপ করিতে পারিতাম না। *

---

* বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ নাটকগুলির সম্বন্ধে শুধুই একটানা প্রশংসার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানের সমালোচকগণ যুক্তির মানদণ্ডে তাহাদের বিচার করিয়া দোষগুলিও দেখাইতে চান। নাট্যবিদ্ সুলেখক শ্রীযুত গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্যেই এইখণ্ডে গিরিশচন্দ্রের সুবিখ্যাত নাটক 'প্রফুল্লর বিচার' আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিচার-ব্যাপারে আমরা নাট্যানুরাগী সুধীসমাজকে শ্রদ্ধা সহকারে আহ্বান করিতেছি। যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং অন্য কোন প্রসিদ্ধ নাটক সম্বন্ধে প্রস্তাব সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

গল্প-ভারতী

সাহিত্যের উদ্যানে শুভ্র বেদিটির উপর বসে দেবকন্যার মতন একটি মেয়ে ফুলের মালা গাঁথছিলেন। ফুলের গন্ধ পেয়ে আট দশ বছরের ছেলে থেকে ৬০।৭০ বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নানা বয়সের বহু নরনারী বেদিটি ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে সবাই ব্যস্ত। তাঁদের সংলাপ নিয়েই আমাদের নাটক। এঁরা করছেন সবাই মিলে জিজ্ঞাসা, মেয়েটি মালা গাঁথতে গাঁথতে হাসি মুখে একাই দিচ্ছেন সবার প্রশ্নের উত্তর।

—তুমি কে গো? একাটি এখানে বসে কি করছ?

—আমি **গল্প-ভারতী**, বাছা বাছা ফুল দিয়ে গল্পের মালা গাঁথছি তোমাদের জন্যে।

—মালা ত দেখছি একটি, আমরা ত এখানে অনেক; ছেলে মেয়ে ছোট বড়, দেখছ না কত।

—তাইত বাছা বাছা ফুলে মালা গাঁথছি; সবাই যাতে পরতে পার.. সমান খুসি হও।

—তা কি কখন হয়? ছোটদের যা ভাল লাগে, বড়রা তাতে কি করে খুসি হতে পারে? সবার মন কি সমান?

—কেন, এমন জিনিস কি কিছুই নেই—সবাই যাকে সমান ভালবাসে, যেটি না হলে চলে না—সব সময়ই সবার চাই।

—কই, মনে ত হচ্ছে না; আচ্ছা, তুমিই বল না!

—কেন, আলো বাতাস জল খাবার? বল, ছেলে বুড়ো সকলের কাছে এদের সমান আদর নয় কি?

—ঠকিয়ে দিলে ত সত্যি! তাহলে তোমার মালাটি পরলে আমরা সকলেই এক সঙ্গে সমান আনন্দ পাব?

—নিশ্চয় পাবে, নইলে আমি এসেছি কেন! আমি ত জানি, সৃষ্টির সুরু থেকে গল্পের কি কদর! এর নামেই শিশুর মুখে হাসি ফোটে, কিশোর মনে কত কৌতূহল জাগে, যৌবনে হয় প্রিয় সাথী, বার্দ্ধক্যে আনে নতুন শক্তি; অবশ্য সর্বকাল সর্বযুগ আর সর্বমনের উপযোগী করে তাকে বলা চাই, গাঁথবার মতন যোগ্যতারও দরকার। কাজটা শক্ত বলে ভারটা আমার ওপরেই পড়ছে, তাই ত আমি এসেছি।

—বল কি! শুনে যে ভারি আহ্লাদ হচ্ছে গো! তুমি যে দেখছি নতুন কথা শুনিয়ে দিলে!

—মালাটি গাঁথা হলে এর মধ্যে অনেক নতুন জিনিসও দেখতে পাবে। দু চারটে নাম করছি শোন: সারা দুনিয়ার ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যেখানে যত গল্প বেরিয়েছে আর বেরুচ্ছে অবাক হয়ে শুনবে। গল্প-দাদুর আসরে বসে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সুবিধাও পাবে। আর, শিল্প বিজ্ঞান কৃষি বাণিজ্য যুদ্ধ হাঙ্গামা এগুলো যদি গল্পের রূপ ধরে দেখা দেয়—কেমন আনন্দ হবে বলত?

—বুঝেছি, নতুন যুগের নূতন মানুষের জন্যে মনের মতন মালা তুমি সাজিয়ে আনছ। এখন বলত, কত বড় হবে, আর কি দাম দিতে হবে।

—একশো দলের মালা আমার—দামটি মাত্র দশ আনা।

বিয়ের উপহার

উমা—তারাদির বিয়ে, কি দেওয়া যায়?

রেবা—খরচ কত করবি আগে বল্

উমা—কত আর, মোটে দু'টাকা

রেবা—তাহলে ঐ টাকায় কিনে দে—

মেয়েদের পিকনিক

গৃহস্থের সুসার

বোস-গিন্নী : তোর রান্নার সুখ্যেত ওঁর মুখে ত ধরে না!
বলেন—তেতো শুক্তোও যেন অমৃত!

রায়-গিন্নী : গুণ রান্নার নয় ভাই, মসলার।

বোস-গিন্নী : কি মসলা ভাই?

রায়-গিন্নী : 'গোটা'—স্নেহলতা প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার।
৪২নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে পাবে।